সরাক সংস্কৃতি
ও
পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি

শ্রীযুধিষ্ঠির মাজী

॥ জৈন ভবন ॥

সরাক সংস্কৃতি
ও
পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি

লেখক

শ্রীযুধিষ্ঠির মাজী

সম্পাদনায়

ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক, শ্রমণ পত্রিকা

॥ জৈন ভবন ॥

জৈন ভবন

পি ২৫ কলাকার ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা ৭০০ ০০৭

।। প্রসঙ্গত ।।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় এক সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠী রূপে সরাকেরা প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বসবাস করছেন। অতীতে বাংলার নানা স্থানে সরাকদের প্রভাব থাকলেও বর্তমানে এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মানুষেরা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূমের কিছু কিছু স্থানে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছেন।

পশ্চিম বাংলায় এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরেই অবহেলিত, অনাদৃত ও উপেক্ষিত হয়ে আসছেন। আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় তাঁদের নিয়ে কোন প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি।

১৯৮০ খৃষ্টাব্দে কলকাতার শ্রমণ পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক গণেশ লালওয়ানী মহাশয়ের সঙ্গে এই বিষয় নিয়েই আমি একটি আলোচনার আসরে বসেছিলাম। লালওয়ানীজী আমাকে এই বিষয়টি নিয়ে কিছু লেখার কথা বলেছিলেন। পশ্চিম বাংলার বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি স্থানের সরাক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এই সব অঞ্চলের ভাস্কর্য শিল্পকলা গভীরভাবে জড়িত রয়েছে। ভাস্কর্য শিল্পকলায় আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খুব কম থাকায় এই কাজে হাত দিতে বেশ ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু প্রয়াত লালওয়ানী মহাশয়ের অনুরোধে ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজটা আরম্ভ করেছিলাম। আমি সরাক জাতির ইতিহাসকে ‘‘সরাক সংস্কৃতি’’ নামে ধারাবাহিকভাবে বহু প্রবন্ধ লিখেছিলাম। ঐ সব প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে এই গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে।

সরাকদের একটা বড় অংশ উড়িষ্যায় বাস করেন। তাই উড়িষ্যার সরাকদের নিয়েও কিছু লিখতে হয়েছে। সরাকদের মন্দিরগুলো যদিও বর্ধমান জেলায় অবস্থিত তবু এই মন্দির প্রসঙ্গে কিছু অপপ্রচার থাকায় প্রসঙ্গক্রমে পুরুলিয়ার মন্দির নিয়ে আলোচনার মধ্যেই সেই সব বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করেছি। এই ভাবে বাঁকুড়ার বহুলাড়ার কথাও এসে গিয়েছে। এই বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরটি এককালে সরাকদের হাতেই তৈরী হয়েছিল।

পরিশেষে এই "সরাক সংস্কৃতি ও পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি" গ্রন্থটি প্রকাশ করার কাজে এগিয়ে এসেছেন তিথয়র (হিন্দী) পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী লতা বোথরা ও শ্রমণ পত্রিকার সম্পাদক ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁদের প্রচেষ্টাতেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থের জন্য কিছু ছবি তুলে দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিলেন আমার বন্ধু অমল ত্রিবেদী। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সরাক সংস্কৃতি ও পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

গ্রাম—কেন্দাহি
ডাক—সেনেড়া
পুরুলিয়া—৭২৩১২১

যুধিষ্ঠির মাজী

সম্পাদকীয়

শ্রমণ পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। এতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো শ্রমণ পত্রিকায় বহু বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রমণ পত্রিকায় সরাক জাতির সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক লেখা বেরিয়েছিল। সব লেখাগুলো এতে দেওয়া সম্ভব হয় নি। যার মূল্য এখনও আছে বলে মনে হয়, সেরূপ কয়েকটি লেখা শ্রমণ থেকে বেছে নিয়ে এ বিশেষ গ্রন্থটি তৈরী করা হয়েছে। সরাক জাতি সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির মাজীর অনেক লেখা শ্রমণ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। উনি নিজে স্বয়ং সবগুলো মিলিয়ে একটা নতুন লেখা সম্পাদন করে দিয়েছেন। সেটাই এখানে সংযোজিত করা হয়েছে। শ্রমণ পত্রিকার লেখাগুলো নেওয়া হয় নি। এ বিশেষ প্রকাশনটিকে সরাক সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটা প্রামাণিক গ্রন্থ ধরা যেতে পারে।

সরাক শব্দটি সংস্কৃত শ্রাবক শব্দ থেকে এসেছে। শ্রাবক শব্দটি প্রাকৃতে সরাঅক হয়। শ্রাবক শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে হয়— শ্+র্+আ+ব্+অ+ক্+অ। তার থেকে *শরাবক (সংযুক্ত বর্ণ ভেঙ্গে শ্রা হয়েছে শরা)। এর পর প্রাকৃতে সরাঅক এবং তার থেকে সরাক (রা এবং অ সন্ধিতে আ-কার)। সুতরাং শ্রাবক শব্দের যা অর্থ সরাক শব্দেরও তাই অর্থ।

শ্রাবক শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নানাভাবে দেওয়া হয়। শ্রাবক হলেন তিনি যিনি গুরুর কাছ থেকে উপদেশ শোনেন (শৃণোতি যঃ সঃ শ্রাবকঃ)। আবার কেহ বলেন যে যিনি বিশ্বাসকে আশ্রয় করে চলেন তিনি শ্রাবক (শ্রদ্ধালুতাং শ্রাতি)। আবার কেহ বলেন যে যার পাপ চলে যায় সে শ্রাবক (শ্রবন্তি যস্য পাপানি)। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন মোটামুটীভাবে বলা যায় যে গুরুর কাছ থেকে যিনি উপদেশ শোনেন তিনিই শ্রাবক।

শ্রাবকদের সম্বন্ধে জৈন শ্রাবকাচার গ্রন্থে অনেক তথ্য নিহিত আছে। কিন্তু এখানে যে সরাক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তারা আত্মবিস্মৃত একটা জৈন সম্প্রদায়। তারা যে জৈন সেটা প্রায় তারা ভুলেই গিয়েছে। আচারে ব্যবহারে,

খাদ্যে ও বিলাসব্যসনে তারা জৈন মতই পোষণ করেন। এই সরাক সম্প্রদায়েরা 'কাটা' শব্দটা হিংসার দ্যোতক বলে ব্যবহার করে না, এমনকি কথা প্রসঙ্গে মুখেও উচ্চারণ করে না। তাদের জীবন যাত্রা প্রণালী সম্পূর্ণ জৈনদের মত। কিন্তু তারা যে জৈন একথা তারাও জানে না।

পুরুলিয়ার উত্তরাঞ্চলের কাশীপুর, রঘুনাথপুর, পাড়া, হুড়া, নেতুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সরাক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য আছে। বললে অত্যুক্তি হবে না যে পুরুলিয়ার যা ঐতিহ্য, তার বেশীর ভাগ এই মানব গোষ্ঠীর অবদান। পুরুলিয়া অঞ্চলের ছড়রা, তেলকূপী, পাকবিড়রা, দেউলঘাটা, দুলমী, পবনপুর, বোড়াম, পাড়া, ছবড়া, প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে যে ভাস্কর্য শিল্প দেখা যায়, তা সরাকদের প্রাচীন কীর্তি।

কালক্রমে সরাকেরা আত্মবিস্মৃতির ফলে হিন্দুদের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল এবং কালে হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত হতে লাগল। কিন্তু হিন্দুয়ানীর মধ্যেও তারা তাদের পূর্ব ধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করে নি। খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে সরাকদের মধ্যে অনেক বিচার আছে। লাইপুই শাক, লাল সীম, গাজর প্রভৃতি লাল রঙের খাবার তারা খায় না। এমন কি, ডুমুর, ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতিও খায় না।

প্রস্তুত গ্রন্থটি সেই সরাক সম্প্রদায়ের লুপ্ত ইতিহাস। সরাকদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেবার জন্য এই গ্রন্থের অবতারণা।

এ বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশ ব্যাপারে শ্রীদিলীপ সিংহ নাহটা এবং তিথয়রের সম্পাদিকা শ্রীমতী লতা বোথরা সর্বরকম ভাবে সাহায্য করেছেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সাহায্য কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করছি। যদি এ সংস্করণটি জন সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়, তাহলে আমার শ্রমকে সাফল্য বলে মনে করবো।

ইতি

কলিকাতা

৩রা মার্চ ২০০১

শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড—স্রষ্টার কথা

১। পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি ঃ গোড়ার কথা ১
২। সরাকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪
৩। সরাকদের গোত্র পিতা ১৫
৪। প্রাচীন অর্থনীতিতে সরাকদের ভূমিকা ১৬
৫। সাহিত্য, সংস্কৃতি, কাহিনী, কিংবদন্তী ও মেয়েলি ছড়া গানে সরাকদের অবদান ১৯
৬। উড়িষ্যার সরাক সংস্কৃতি ২৭

দ্বিতীয় খণ্ড—সৃষ্টির কথা

১। পুরুলিয়ার প্রাচীন মন্দির ৩৬
২। পাকবিড়রা ৩৯
৩। বোড়াম (দেউল ঘাটা) ৪৫
৪। বুধপুর-পলমা-মহাদেব বেড়্যা ৫০
৫। পাড়া ৫৩
৬। দেউল ভিড়্যা ৫৭
৭। ছড়রা ৬০
৮। তেলকূপী ৬২
৯। চেলিয়ামা ৬৭
১০।শেষের কথা ৭০

বরাকরের সরাক জৈন মন্দির

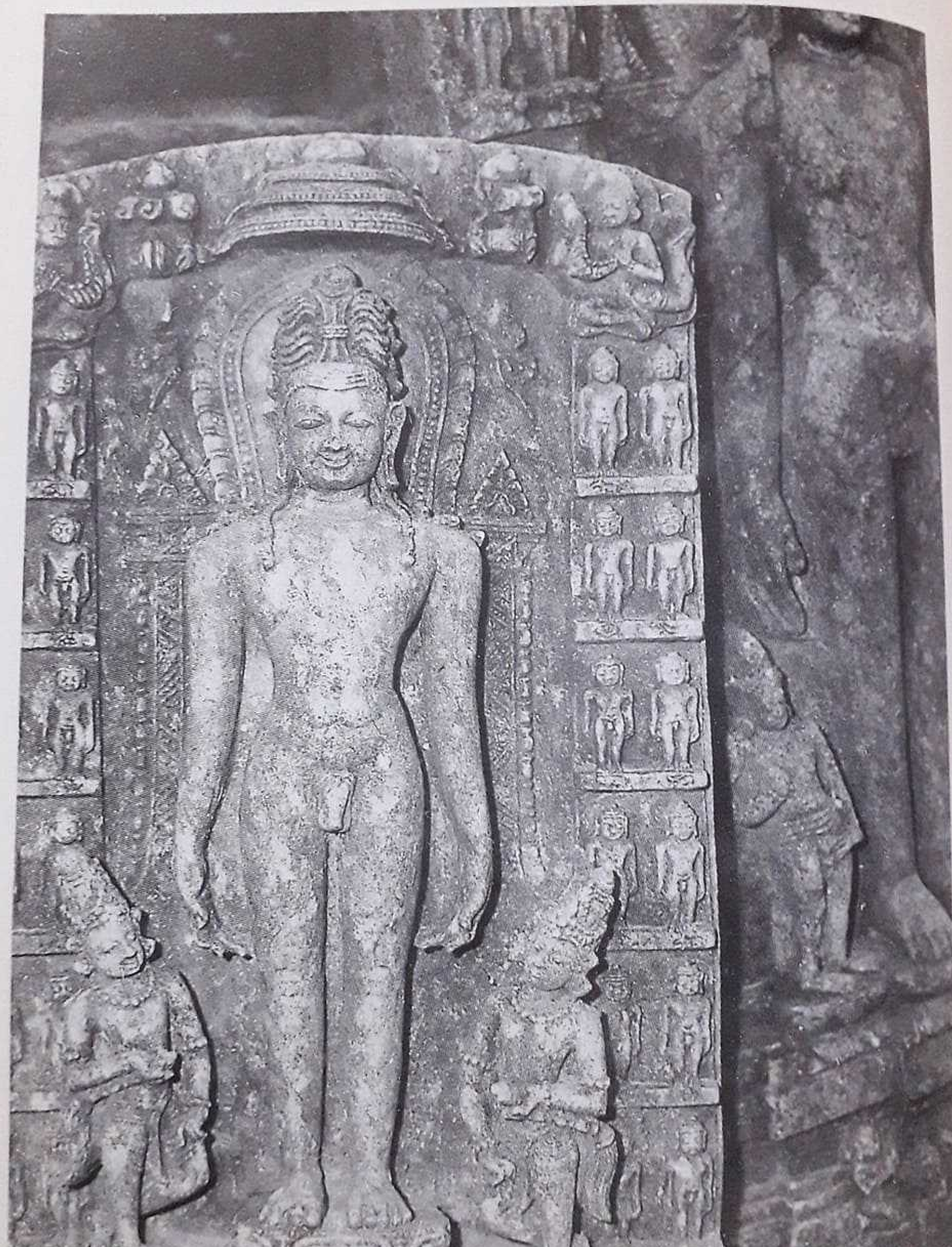

ঋষভনাথ, পাকবিরা ১০শ শতাব্দী

ঋষভনাথ, পাকবিরা ৭ম শতাব্দী

শান্তিনাথ, পাকবিরা ১০শ শতাব্দী

চেলিয়ামা জৈন মন্দির

ঋষভনাথ, ভৈরবসিংহপুর, উড়িষ্যা

ঋষভনাথ, ভৈরবসিংহপুর, উড়িষ্যা

সরাক জৈন মন্দির

সরাক সংস্কৃতি ও পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি

যুধিষ্ঠির মাজী

পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি ঃ গোড়ার কথা

পুরুলিয়ার পুরাকীর্তির গোড়ার কথা ভাবতে গিয়ে আমাদের মনের আকাশে তিনটি কথা উদয় হয়। প্রথমটি হল-The cossai is rich in architetural remains,[১] দ্বিতীয়টি হল- The saraks have been described as the remnant of an archaic community.[২] আর তৃতীয়টি হল- The saraks are credited with buildings, the Temples at Para, Charra, Boram and other places in these pre-Bhumej days.[৩]

প্রথম কথাটির মধ্যে আছে সৃষ্টির কথা। আর অপর দুটি কথার মধ্যে আছে স্রষ্টার ইতিহাস। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা এই দুটোকে ভাল করে না জানলে জানার কাজে পূর্ণতা আসে না। তাই পুরুলিয়ার পুরাকীর্তির কথা বলতে গেলেই আপনা হতেই সরাকদের কথা এসে যায়।

পুরুলিয়া অঞ্চলের এই সৃষ্টি এবং স্রষ্টা দুটোই আমাদের কাছে অজানা রয়ে গিয়েছে। ইতিপূর্বে ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্প ও পুরাকীর্তি নিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেই সব গ্রন্থে পুরুলিয়ার পাথরের মন্দিরগুলোর প্রসঙ্গে খুব কম কথাই আছে। পশ্চিম বাংলার মানুষদের নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু সেই সব গ্রন্থেও পুরুলিয়ার পাথুরে মানুষ সরাকদের খুঁজে পাওয়া যায় না।

অতীতের কংসাবতী হল রত্নগর্ভা। তার বুকে কত যে অমূল্য রত্ন লুকিয়ে আছে তার হিসেব কেউ রাখেন না। কংসাবতীর তীরবর্তী অঞ্চল পাকবিড়রা, বুধপুর, বোড়াম অতীতের শুধু তীর্থভূমিই নয়, রত্নভূমিও বটে। পাথর যে সোনার চেয়েও দামী হতে পারে তা এখানে না এলে বোঝা যায় না। পাকবিড়রা তো পুরুলিয়ার যাদুঘর। এর মাটিতে কত যে অমূল্য ভাস্কর্য শিল্পকলার নিদর্শন লুকিয়ে আছে তার কোন হিসেব নেই। এখান থেকে কত অমূল্য শিল্পদ্রব্য বিদেশের বাজারে পাচার হয়ে গিয়েছে তারও হিসেব আমরা রাখি না।

---

১. Lt. Col. E.T. Dalton

২. Mr. G. Coupland.

৩. Mr. G. Coupland.

বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত অতীতের বুধপুর আজ মৃত। কিন্তু এই মৃতদেহে ময়না তদন্তের কাজ চালালে যে জৈন ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যাবে সেটাও সোনার চেয়ে কম দামী হবে না।

বলরামপুর, বোড়াম, দুলমী প্রভৃতি পুরাক্ষেত্রের মাঝে আজও ইতিহাস বন্দী হয়ে আছে। বোড়ামের তীর্থক্ষেত্রে মহিষাসুর মর্দ্দিনী অষ্টভুজা দুর্গা ভাঙ্গা মন্দিরের রুদ্ধ কক্ষে যেন ফসিল হয়ে গিয়েছে। চাপা পড়ে গিয়েছে অতীতের এক গৌরবময় ইতিহাস।

দামোদর এককালের বিপদজনক নদ। এর তীরবর্তী অঞ্চল তেলকূপী পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পাড়া দেউল ভিড়্যা অতীতের পুণ্য তীর্থভূমি। তেলকূপীর বুকে ঘুমিয়ে আছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগের নগর সভ্যতার এক চমকপ্রদ নিদর্শন। কত বণিকের কর্মস্থল, কত শিল্পকলার বাজার, কত মানুষের লীলাভূমি এই তেলকূপী তার হিসেব আমরা রাখতে পারেনি।

মন্দির শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন বুকে নিয়ে পাড়া আজও আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। এখানের মন্দির প্রাঙ্গণে সুদর্শনা নর্তকীদের অপূর্ব দেহবিন্যাস আর নৃত্য পদপাতের সুমধুর ধ্বনি কোন এক দূরাগত শব্দহীন সঙ্গীতের মত আমাদের মরমে প্রবেশ করে রক্ত ধারায় ঝড় তোলে।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, দামোদর, বরাকর প্রভৃতি নদ-নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সেদিন কোল, ভীল, সাঁওতাল ছাড়া আর কোন সভ্য মানুষের নিদর্শন ছিল না।

আদিবাসীরা এখানে এক বিপদজনক জাতি বলে পরিগণিত হত। এই জঙ্গলময় দেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে হঠাৎ একদিন দেখা গেল আলোর নিশানা। শ্রমণ সংস্কৃতির এক বিরাট ঢেউয়ে যেন অতীতের মানভূম, ধলভূম, সিংভূম এবং উড়িষ্যার বেশ কিছুটা জঙ্গলময় অঞ্চলকে ভাসিয়ে দিল। নদী তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠল বন কেটে বসত। প্রাণহীন বোবা পাথরের বুকে দেখা গেল হৃদযন্ত্রের গতি। পাথরের বুকে শোনা গেল মন রাজার গনি।

কত শিল্পীর সাধনা হল ধন্য। অহিংসা ধর্মের কত প্রাণপুরুষ লাভ করল দেবত্ব। কত দেবদূত ছড়িয়ে পড়ল পুণ্যময় জঙ্গল ভূমিতে। সেদিন পাথর সোণার দামে বিক্রি হবার জন্য এসে হাজির হল তাম্রলিপ্ত বন্দরে। সেখান থেকে পাড়ি দিল জাভা, বর্নিয়ো, সারাওয়াক প্রভৃতি দেশের নানা অঞ্চলে।[৪]

সারাওয়াকের সাংস্কৃতিক জীবনে এখানের অতীতের সারাকদের কোন প্রভাব পড়েছে কিনা জানি না। যাইহোক অতীতের ছোটনাগপুরের এই বিস্তৃত মালভূমি

৪. সারাওয়াক উত্তর বর্নিয়োর একটি দেশ।

প্রধান অঞ্চল ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রের পূর্ব ভারতের এক কেন্দ্র ভূমিতে রূপান্তরিত হল।

উড়িষ্যার অতি কাছে উড়িষ্যার শিল্প ও সংস্কৃতির প্রাণের গান শোন গেল পুরুলিয়ার মাটিতে। কিন্তু শিল্পাদর্শে পুরুলিয়া যেন উড়িষ্যা থেকে অনেক দূরে সরে গেল। এখানে যেন কামের মৃত্যু হল। জন্ম নিল প্রেম। কত যক্ষিণী প্রেমের ডালা সাজিয়ে বসে রইল মন্দির গাত্রে। কত নর্তকীর নাচের ছন্দে পুরুলিয়ার শক্ত মাটি কেঁপে উঠল। এখানের ভাস্কর্য শিল্প জাত নরনারীরা নিজেদের দেহ দেখিয়ে মানুষের মন ভুলায় না। গান গেয়ে আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। হিংসা নয়, অহিংসার বাণী নিয়ে মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হলেন অহিংসা ধর্মের প্রাণপুরুষ মহাবীর। কালক্রমে তিনি আবার রূপান্তরিত হলেন মহাকাল ভৈরবে। ভাঙ্গা মন্দির ভাঙ্গা শিল্পকলা। কিন্তু কে ভাঙ্গল সভ্যতার ইমারত ? মন্দিরে মন্দিরে ঘুরলে দেখা যাবে কত ধর্ম গোঁড়া মানুষের কালো হাত সুন্দরকে করেছে অসুন্দর। মন্দিরকে মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। মন্দিরের মহামূল্য শিল্পকলায় সমৃদ্ধ ছাল ছাড়িয়ে তার কবর দিয়েছে মন্দিরের পাদদেশে। কত অমূল্য শিল্পকলা নিক্ষিপ্ত হয়েছে নদীতে, পুকুরে, বনে-জঙ্গলে। স্বর্গকে টেনে নামিয়েছে নরকের মাঝে। কে করল এই অপকর্ম তা ইতিহাসের বুকে লেখা নেই; লেখা আছে এখানকার পাষাণ ফলকে।[৫] পুরুলিয়ার ভাস্কর্য শিল্প অতীত পুরুলিয়ার এক জীবন্ত ইতিহাস। অতীতের মহান তীর্থঙ্কর, ধরণেন্দ্র পদ্মাবতী, শিব পার্বতী, মহিষাসুর মর্দ্দিনী দুর্গা, কুমারী দেবী, পর্ণশবরী, দেবী অচ্যুতা, দেবী অম্বিকা, কুমার কার্তিক, গণেশ, আর লীলাময়ী যক্ষিণীরা মিলে মিশে রচনা করেছেন অতীতের এক দৃশ্য মহাকাব্য। এই বিরাট মহাকাব্যের নায়ক নায়িকাদের একদিন মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ওঁরা মরেন নি, বেঁচে আছেন উত্তর পুরুষদের জন্য কিছু ইতিহাস হাতে নিয়ে।

বেঁচে আছেন অমর শিল্পকলার স্রষ্টাদের উত্তর পুরুষ সীমান্ত বাংলার সরাক সম্প্রদায়। ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রান্তে এত প্রাচীন জৈন জাতি বাস করেন কিনা আমার জানা নেই। হাজার হাজার বছরের ঘাত-প্রতিঘাত উত্থান-পতন ও সামাজিক বিবর্তন সহ্য করেও সরাকেরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছেন। তাঁরাই সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষের জৈন ধর্মে দীক্ষিত জনগণের উত্তর পুরুষদের একটি শাখা। এই শাখার মানুষ ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই।

---

৫. ভ্রান্ত ধর্ম চিন্তা ও ধর্মীয় গোঁড়ামী পৃথিবীর মানুষের যত রক্ত ঝরিয়েছে, মানব সভ্যতার যত ক্ষতি করেছে ততটা ক্ষতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধও করতে পারেনি। ভ্রান্ত ধর্ম চিন্তা পৃথিবীর বহু যুদ্ধের কারণ হয়েছে।

।। এক ।।

সরাকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া জেলাকে যদি উত্তর দক্ষিণে দুভাগে ভাগ করা হয় তবে দেখা যাবে যে দক্ষিণের বাঘমুন্ডি, বলরামপুর, ঝালদা, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে যেমন মাহাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য রয়েছে, ঠিক তেমনি উত্তরাঞ্চলের কাশীপুর, রঘুনাথপুর, পাড়া, হুড়া, নেতুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সরাক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য আছে। সরাক সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুসন্ধানের অভাবে পশ্চিমবাংলার পন্ডিত মানুষদের ধারণা খুব বেশি নেই। অনেকে মনে করেন সরাক জাতির মানুষেরা কোন কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন এবং এঁদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কিন্তু এঁদের সংখ্যা অল্প নয়। উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও সম্প্রদায়গত একতার অভাবে এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বৃহত্তর মানব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। অথচ এঁদের যা ঐতিহ্য আছে পুরুলিয়া জেলার অন্য কোন মানব গোষ্ঠীর তা নেই।

সরাক সম্প্রদায় এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। আদিবাসীদের পরেই এঁদের স্থান। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ বা ৬০০ বৎসর আগে এই মানভূম অঞ্চল ছিল এক বিশাল অরণ্যভূমি। কোল, ভীল আর সাঁওতাল জাতির মানুষ ছাড়া আর কোন সভ্য মানুষের সন্ধান এখানে পাওয়া যেত না। এই আদিবাসীরা ছিল বজ্রের মত কঠিন এবং বিপদজনক সম্প্রদায়। এই কারণে আদিবাসীদের বলা হত বজ্রভূমিজ। এই সময়ের অনেক আগে থেকেই জৈন ধর্মের প্রচার করা এই জঙ্গলময় ভূমিতে এসে এক নতুন সভ্য সমাজ গড়ে তুলে ছিলেন। তখন এই জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষদের বলা হত সুখী ভূমিজ। এই সুখী ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষেরাই এই অঞ্চলে সরাক নামে পরিচিতি লাভ করেন। পাশ্চাত্ত্য পন্ডিতগণের মতে সরাক শব্দটি শ্রাবক শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ শ্রোতা। বৈদিক যুগে যেমন করে ঋষিরা অনার্যদের সরিয়ে দিয়ে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বন কেটে আশ্রম বানিয়ে সাধন ভজনের মধ্য দিয়ে এক নতুন সভ্যতার আলো জ্বেলে ছিলেন, ঠিক তেমনি সরাকেরাও এই অঞ্চলে এসে আর্য সংস্কৃতির আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন বনাঞ্চল। মিস্টার ডাবলিউ হান্টারের ভাষায় বলা যায়—

The early Jain devotees, like the primitive Risis on the vedic period went out and established hermitage in the jungles which became the centre of a colony of Jain worshippers.[৬]

৬. Statistical Account of the District of Manbhum.

প্রাচীন সংস্কৃতির একটা বিশেষ অঙ্গ হল ভাস্কর্য শিল্প। সরাকেরা তো আবার শিল্পীর জাত। তাছাড়া ধর্ম সংস্কৃতির প্রয়োজনেও সরাকেরা আশ্রয় নিলেন ভাস্কর্য শিল্পের দেবতার কাছে। ছড়রা, তেলকূপী, পাকবিড়রা, দেউলঘাটা, দুলমী, পবনপুর, বোড়াম, পাড়া, ছবড়া, সেনেড়া প্রভৃতি অঞ্চলে মন্দির নির্মাণ করে সরাকেরা একটা বিশেষ সংস্কৃতির ভিত্তিকে পাকা করে নিলেন। এইসব স্থানে সরাকদের প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন আজও বজায় রয়েছে। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ বছর আগে থেকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত সরাকেরা মন্দির নির্মাণের কাজ চালিয়েছিলেন। সপ্তম শতাব্দী থেকে তাঁদের কাজে বাধা এসেছিল। এই বাধার প্রাচীর শক্ত হয়েছিল একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। এই সময়টাতেও বেশ কিছু মন্দির ও ভাস্কর্য শিল্প তৈরী হয়েছে কিন্তু ধ্বংস হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি।

তাই বলা যায় এই অঞ্চলে সরাক সংস্কৃতির গতিপথ সোজা পথে চলেনি। প্রথম দিকে তাঁরা আদিবাসীদের সঙ্গে সংগ্রাম করে বসত বানিয়েছিলেন। এই বসতের নাম দিয়েছিলেন বীরভূমি। তীর্থঙ্কর মহাবীর যখন এখানে এসেছিলেন তখন এই অঞ্চলটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল– বীরভূমি আর বজ্রভূমি। বজ্রভূমি ছিল আদিবাসী প্রভাবিত অঞ্চল। আদিবাসীরা মহাবীরকে ভাল চোখে দেখতে পারেনি। তারা তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। তীর দিয়ে আক্রমণ করেছিল। এই আক্রমণ প্রতিহত করতে এগিয়ে এসেছিল সরাকেরা।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দী হতে তথাকথিত হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারক ও বাহক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রাম বেধেছিল সরাকদের। গোঁড়া হিন্দুরা সরাক সংস্কৃতিকে এই অঞ্চল থেকে মুছে ফেলতে সরাক বিতাড়নের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই আক্রমণের তীব্রতা খুব বেড়ে গিয়েছিল। বহু মন্দির ভাঙ্গা হয়েছিল। বহু ভাস্কর্য শিল্প নষ্ট করা হয়েছিল। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, হিন্দুদের ভাস্কর্য শিল্প ধ্বংস হয়েছে মুসলমানদের হাতে। কিন্তু এই অঞ্চলে মুসলমানদের দ্বারা কোন ধ্বংস লীলা চলেছিল এমন নজির ইতিহাসে নেই। তাছাড়া মন্দির থেকে জৈন বিগ্রহ সরিয়ে সেখানে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন মুসলমানেরা একথা ভাবা যায় না। তাই পুরুলিয়া অঞ্চলের ভাস্কর্য শিল্পের ধ্বংস কর্তা যে গোঁড়া হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[১] এই কাজে ধ্বংস কর্তারা যে হিন্দু রাজাদেরও সমর্থন লাভ করেছিলেন তারও কিছু কিছু নজির রয়েছে।

১. এ অভিমত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের। আমার মতামত গ্রন্থের শেষের কথায় আছে।

বরাকরের সুন্দর পাথরের মন্দিরগুলো তো এককালে জৈন মন্দিরই ছিল। ওইগুলো তৈরী হয়েছিল ওই অঞ্চলের সরাকদের হাতে। এই মন্দির নির্মানের জন্য সরাকেরা গুজরাট থেকে সরাক শিল্পীদের আনিয়ে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মিস্টার জি. কুপল্যান্ড কিম্বদন্তীর আকারেই যে মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি।

There is a tradition that they (Saraks) ordinarily came from Gujrat but in the former district the popular belief is that they were brought the sculptors and masons for the construction of stone temples and houses the remains of which are still visible on the bank of Barakar.[৮]

কিন্তু বরাকরের এই সুন্দর সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মন্দিরগুলো শিব মন্দিরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী বিজ্ঞাপনেও দেখা যায় এই মন্দিরগুলোকে শিব মন্দিররূপে।

বরাকরের জৈন মন্দিরগুলোকে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তর করার কাজে ওই অঞ্চলের এক রাণীর নাম পাওয়া যায়। রাণী হরিপ্রিয়া ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে জৈন বিগ্রহ সরিয়ে এইসব মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

On the most modern is an inscription in old Bengali dated 1383 of the Saka era, corresponding to A.D. 1455 recording the dedication of some idols by Haripriya the favourite wife of a king. Statisticle Accounts of Bengal vol. XVII by W.W. Hunter.

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে সেকালের পুরুলিয়া অঞ্চলের গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হাতে শুধুমাত্র এই অঞ্চলের মন্দির ও ভাস্কর্য শিল্পই নষ্ট হল না, সরাক জাতিও নষ্ট হতে চলল। সরাকেরা ঘর-বাড়ি ছাড়লেন, মন্দির ছাড়লেন, দেশ ছাড়লেন, ছাড়লেন শিল্পকর্ম। তাঁরা পালিয়ে গেলেন দূর দেশে। একটা প্রাচীন সংস্কৃতির বিরাট বাড়ির ভাঙা ইঁট, কাঠ, পাথরগুলো যেন ঝরে পড়তে লাগল। সরাকদের এই অসহনীয় অবস্থার কথা স্যার হারবার্ট রিশলে তাঁর চোখের জলে লিখে গিয়েছেন ভারতের জনগণ গ্রন্থে-

They (Saraks) have split up into endogamous groups based partly on locality and partly on the fact that some of them have taken

৮. Gazetter of Manbhum District.

to the degraded occupation of weaving and they now form a Hindu Caste of ordinary type.[৯]

ফলে ধর্ম-কর্ম ছেড়ে মানুষগুলো গ্রামে গ্রামে তাঁত বুনতে আরম্ভ করলেন। জন্ম হল সরাকী তাঁতীর। উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে ও পশ্চিমবাংলার বিষ্ণুপুরে এরা আজও আছেন।

ছিলেন কবি কঙ্কণ চণ্ডীর যুগেও। আসলে সরাকেরা শিল্পীর জাত। যে হাতে পাথর কেটে মূর্তি বানিয়ে তাতে প্রাণ স্পন্দন জাগিয়ে হৃদয়ের গান শুনিয়েছিলেন, সেই হাতেই কাপড় বুনে তৎকালীন রাজাদের কাজে বাড়ি উপহার পেয়েছিলেন। মধ্য যুগে সরাকদের অবস্থা প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে লিখেছেন ঃ

সরাক বসে গুজরাটে, জীব জন্তু নাহি কাটে,
সর্ব্বকাল করে নিরামিষ।
পাইয়া ইনাম বাড়ি বুনে নেত পাট শাড়ি
দেখি বড় বীরের হরিষ।

শিল্পীর জাত সরাকেরা কাপড় বুনে কৃতিত্ব দেখালেন। তাঁরা তসর শিল্পে, পাট শিল্পে, দক্ষ শিল্প হয়ে উঠলেন। উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও পশ্চিমবাংলার বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া আর রঘুনাথপুর তাঁদের যাদু দণ্ডে তসর শিল্পে বিখ্যাত হয়ে গেল। কিন্তু সরাকদের এই সুনাম সহ্য হল না গোঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের। তারা সরাকদের জোলা বলে উপহাস করলেন। এরই নিদর্শন পাওয়া গেল ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। সরাকেরা কাপড় বুনত বলেই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের রচয়িতা সরাকদের জোলা বলে বর্ণনা করে গিয়েছেন। সে সময় জোলারাও কাপড় বুনত। জোলারা মোটা কাপড় বুনত। অর্থাৎ সুতার কাপড় । কিন্তু সরাকেরা মোটা কাপড় বুনতেন না। তাঁরা ছিলেন নেত এবং পাট শিল্পী। এই পাট আর তসরের কাপড় পরত দেশের সব বড় মানুষেরা। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মন্তব্য বিভ্রান্তিমুলক। এই বিভ্রান্তির কথা বলতে গিয়ে মিস্টার কুপল্যান্ড লিখেছেন-

The origin of the caste is ascribed in the Brahma Vaivartha Purana to the union of Jolaha man with a woman of the Kuvinda or weaver caste. This however merely shows that at the time when the puran was composed or when the passage was interpolated the saraks had already taken to weaving as a means of livelihood.[১০]

---

৯. The people of India.
১০. Gazetter of Manbhum District- G. Coupland.

সরাকদের প্রতি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিরূপ ধারণার একটা বড় ধরণের উদাহরণই রেখে গিয়েছেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ তাঁদের অজান্তে তাঁদের লিখিত গ্রন্থ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। দীর্ঘদিন ধরে ব্রাহ্মণ ও গোঁড়া হিন্দুদের মানুষদের কাছ থেকে অত্যাচারিত হওয়ার ফলে সরাক সম্প্রদায়ের মানুষদের ভূমিজ রাজাদের অনুগ্রহে বসবাস করার একটা প্রবণতা এসে গিয়েছিল। কবি কঙ্কণ চণ্ডীর যুগ থেকে বর্গী আগমনের কাল পর্যন্ত সরাকেরা রাজাদের আশ্রয়ে বসবাস করে এসেছেন। ধলভূমের রাজা মানসিংহের আশ্রয়ে বহু সরাক প্রজা বাস করতেন। রাজা মানসিংহের সঙ্গে সরাকদের সম্বন্ধটা খারাপ ছিল না। তবে এক সময় রাজা মানসিংহ সরাক পরিবারের কোন এক মেয়ের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করায় সরাকেরা রাজা মানসিংহের প্রতি বিরক্ত হন ও তার প্রতিবাদে দলে দলে ধলভূম ত্যাগ করে পাঁচেত অঞ্চলে চলে আসেন। সরাকেরা অন্যায় যেমন করেন না ঠিক তেমনি অন্যায় সহ্যও করেন না। এই ঘটনায় সরাকদের সেই মানসিকতাই ফুটে উঠেছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে মিস্টার কুপল্যান্ড লিখিছেন–

They (Saraks) first settled near Dhalbhum in the estate of a certain man Raja. They subsequently moved in a body to Panchet in consequence of an outrage contemplated by Man Raja on a girl belonging to their caste.[১১]

ধলভূম থেকে পালিয়ে আসা সরাকদের এই শাখা পঞ্চকোট রাজার শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়ে পড়েন। এখানে তাঁদের নবজন্ম হয়। অর্থাৎ তাঁরা জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা এখানে পঞ্চকোট রাজাদের সাহায্যে হিন্দুদের মত পদবী ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাভ করেন।

সরাকদের এই জৈন ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে রূপান্তরের পশ্চাতে এক চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। এই সময়টা ছিল বাংলায় বর্গী আগমনের কাল। তখন কাশীপুরের রাজাদের রাজধানী ছিল পঞ্চকোট পাহাড়ের পাদদেশে। বর্গী আক্রমণে বিপর্যস্ত রাজ পরিবারের কোন এক শিশুপুত্রকে নাকি সরাক সমাজের কোন একজন লুকিয়ে রেখে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন। তারপর একটু বড় হলে এই ছেলেকে তাঁরা রাজ পরিবারে ফেরত দিয়েছিলেন। এরই প্রতিদানে সরাকেরা হিন্দুদের মত মর্যাদা, সম্মান ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাভ করেন। আর চাষ যোগ্য বহু জমি দিয়ে রাজ পরিবারের লোকেরা সরাকদের প্রগতিশীল এবং দক্ষ চাষীতে রূপান্তরিত করেন। এ প্রসঙ্গে মিস্টার কুপল্যাডের অভিমত হল –

---

১১. Gazetter of Manbhum District.

They (saraks) were not served by Brahmins of any kind until they were provided with a priest by a former Raja of Panchet as a reward for a service rendered to him by Saraks who concealed him when his country were invaded by the Bargis in the Marhattas.[১২]

সরাক সম্প্রদায়ের পদবীগুলো নাকি সবই রাজাদের দেওয়া। এই পদবীগুলো হল- মাঝী, মন্ডল, নায়েক, পাত্র, বৈষ্ণব, সিংহ প্রভৃতি। পশ্চিম বাংলার বাইরের সরাকদের এই ধরণের পদবী দেখা যায় না। বিহারের গ্রামাঞ্চলের সরাকদের ও পাবাপুরী অঞ্চলের সরাকদের এই ধরণের পদবী নেই। উড়িষ্যার সরাকদের মধ্যেও এই ধরনের পদবী দেখা যায় না।[১৩] সুতরাং এখানের সরাকদের পদবীগুলো যে রাজাদের দেওয়া 'রাজ টাইটেল' সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সরাকদের পদবীগুলো রাজাদের প্রচেষ্টায় পাল্টালেও তাঁদের গোত্রগুলো কিন্তু আগের মতই রয়ে গিয়েছে। সরাকদের মূল গোত্র দুটি আদিদেব এবং ঋষিদেব বা ঋষভদেব। এছাড়া কিছু কিছু স্থানে শান্ডিল্য, কাশ্যপ, অনন্তদেব, ভরদ্বাজ, গৌতম প্রভৃতি গোত্র দেখা যায়। গৌতম গোত্র বীরভূমের সরাকদের মধ্যে বেশি প্রচলিত।

পরবর্তীকালে পঞ্চকোটে আগত সরাকেরা চার ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। যাঁরা পঞ্চকোটের রাজাদের দেওয়া জমি-জমা নিয়ে মাটি আঁকড়ে পঞ্চকোটেই পড়ে রইলেন তাঁদের বলা হল পঞ্চকোটিয়া। ওই সময় পঞ্চকোটিয়াদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮০০। পরবর্তীকালে আরও ১৪০০ সরাক এঁদের সঙ্গে যোগ দেন। ফলে পঞ্চকোটিয়াদের মধ্যে একটা কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি হয়। আগেকার আসা ১৮০০ সরাকদের বংশধরেরা পরবর্তীকালে আগত ১৪০০ সরাকদের বংশধরদের চেয়ে কুলীন বলে বিবেচিত হতে থাকেন।

যাঁরা দামোদর নদী পার হয়ে বর্ধমান জেলায় চলে গেলেন, তাঁরা হলেন নদীপারিয়া। যাঁরা বীরভূমে চলে গেলেন, তাঁদের বলা হল বীরভূমিয়া। আর যাঁরা রাঁচী জেলায় তামার পরগণায় চলে গেলেন, তাঁরা হলেন তামারিয়া।

পরবর্তীকালে পঞ্চকোটিয়ারা আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে যান এবং বিহারের কিছু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। এছাড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলের সরাকেরা অনেক আগে থেকেই বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত ছিলেন বলে তাঁদের বলা হত সরাকী তাঁতী। এঁদের মধ্যে আবার অশ্বিনী তাঁতী, পাত্র, মান্দারানী প্রভৃতি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। সাঁওতাল পরগণার সরাকেরা প্রায় চারটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছেন, যথা- ফুল সরাকী, শিখরিয়া, কান্দালা এবং সরাকী তাঁতী।

---

১২. Gazetter of Manbhum District.
১৩. বর্তমানে উড়িষ্যার সরাকেরাও বেশ কিছু উড়িষ্যার জাতির পদবী গ্রহণ করেছেন।

সরাকদের এই বিভাজনটা ঘটেছিল তিন থেকে চারশ বছর আগে। প্রায় ৬০০ বছর আগে এই অঞ্চলটা সরাকদের আদিবাস ভূমিই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে তাঁরা অনেকটা যাযাবর জাতির মত বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। তারপর আবার সরাকদের একটা শাখা ফিরে এসেছিলেন নিজ বাসভূমে স্থানীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

সরাক সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার নিখুঁত নিদর্শনটি দেখা যায় পাঁচেত অঞ্চলেই। এখানের সরাকেরা খুব রক্ষণশীল বলে প্রচীন সরাক সংস্কৃতিকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন। এঁদের মধ্যে যে ধরনের আত্মমর্যাদা দেখা যায় সেরকমটি অন্য কোন সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে দেখা যায় না।

এই বিংশ শতাব্দীতেও এখানকার সরাকদের যে সব বৈশিষ্ট্য সব সম্প্রদায়ের মানুষদের আকর্ষণ করে তা হল-

১) সরাকেরা সম্পূর্ণভাবে নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। সরাক মেয়েরা রান্নার সময় কাটা শব্দটি ব্যবহার করেন না।
২) সরাক সমাজের কোন মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন না।
৩) নিজেদের কোনরূপ নীচ কাজে বা অমর্যাদাকর পেশায় নিযুক্ত করেন না।
৪) সরাকদের কোন মানুষ কোনরূপ ঘৃন্য অপরাধের জন্য আদালত থেকে শাস্তি পান নি। অর্থাৎ এঁদের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প।
৫) মেয়েরা খুব রক্ষণশীল। বাইরে কোনক্রমেই অন্য কোন জাতের বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করেন না বা রাত কাটান না।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দীর্ঘদিন ধরে এই সম্প্রদায়ের মানুষদের আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত বিভিন্ন পণ্ডিতগণের রচনায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্থান লাভ করে সরাকদের সামাজিক মর্যাদাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মিস্টার ই. টি. ডাল্টন পুরুলিয়ার সরাক প্রভাবিত গ্রাম ঝাঁপড়া পরিদর্শন করেন। তিনি সরাক সমাজের মানুষদের আচার আচরণ, রীতিনীতি ও তাঁদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন-

They called themselves Saraks and they prided themselves on the fact that under our government not one of their community had ever been convicted of a heinous crime.[১৪] তিনি আরও তাঁদের বুদ্ধি বৃত্তির প্রশংসা করে লিখেছেন- Who (Saraks) struck me as having a very respectable and intelligent appearance.[১৫]

১৪. Notes on a Tour in Manbhum in 1864-65.
১৫. The People of India.

সরাকেরা তাঁদের সেদিনের ঐতিহ্য আজও বজায় রেখেছেন। তাঁরা একটা সুশৃঙ্খল জাত। সরাকেরা আইন মাথা পেতে নিয়ে বাস করতে ভালবাসে। কোন কারণেই তাঁরা কোনদিন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি। মিস্টার ডাল্টনের ভাষায় বলা যায়- They are essentially a quiet and Law abiding community living in peace among themselves and with their neighbours. মিথ্যাচার নয়, মানুষকে গড়ে তোলাই তাঁদের ধর্ম। তাই সরাকেরা শিক্ষকতার কাজটাকেই বরণ করে নিয়েছেন। পাঁচেত অঞ্চলের স্কুলগুলোতে যেসব শিক্ষকরা কাজ করেন তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষকই সরাক সম্প্রদায়ের মানুষ।

সরাক মেয়েদের রীতিনীতির কথা বলতে গিয়ে মিস্টার হারবার্ট রিশলে সরাকদের রান্নাঘরে প্রবেশ করেছেন। তিনি সরাকদের অহিংসা ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা আর সততার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন-

Their name is variant of Sravaka the designation of the Jainlaity, they are strictly vegetarians never eating flesh and on no account taking life and if in preparing their food any mention is made of the word cutting the omen is deemed to disastrous that every thing must be thrown away.[১৬]

যা রক্তের মত লাল তা খেতে সরাকেরা পছন্দ করেন না। লাইপুই শাক, গাজর, লাল সীম প্রভৃতি খেতে তাঁদের মানা আছে। এছাড়া ব্যাঙের ছাতা, ডুমুর প্রভৃতিও তাঁদের রান্না ঘরে ঢোকে না। এ প্রসঙ্গে লোক জীবনে একটি সুন্দর ছড়া প্রচলিত আছে।

উমুর ডুমুর পুড়ুং ছাতি।
তিন খায় না সরাক জাতি।

সরাকদের সামাজিক উৎসব, বিবাহের রীতিনীতিগুলো বেশ বিচিত্র। এঁদের বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে ফুলশয্যা বা বাসর জাগানোর কোন রীতি নেই। সম্ভবতঃ বিয়ের পর কয়েকটা মাস তারা বর-কনেকে একটু আলাদা করে রাখতে চান। কারণ এই সময়টা হল স্বামী-স্ত্রীর মিলনের প্রস্তুতির কাল। এই প্রস্তুতির কালে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মিলনের আকাঙ্খা বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়ে মিলনের ক্ষণকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। এই কারণে সরাক সমাজের দ্বিরাগমনের প্রথা খুব জনপ্রিয়। বিয়ের সময় বরের মাথায় টোপর থাকে না। থাকে পাগড়ী ও মোড়। বিয়ের আগের দিন গায়ে হলুদ অর্থাৎ গন্ধাধিবাস হয়।

১৬. এখন অবশ্য অনেক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন বরকে বরের বাড়িতে কনেকে কনের বাড়িতে ধান-দুর্বা দিয়ে আর্শীবাদ করে বরের হাতে যাঁতি এবং কনের হাতে কাজললতা দেওয়া হয়। বিয়ের দিন অর্থাৎ বিয়ের রাত্রে কেবল মাত্র কন্যা সম্প্রদান অনুষ্ঠানটিই অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন সকালবেলায় যজ্ঞ এবং হোম হয়। অগ্নি সাক্ষী করে বর কনেকে গ্রহণ করেন। সিঁথিতে সিঁদুর পড়িয়ে দেন। দুপুরবেলায় হয় বন্দনা অনুষ্ঠান। আগে এই বন্দনা অনুষ্ঠানে বর কনের বন্দনা গান গাওয়া হত। এই অনুষ্ঠানে রঙ খেলার রীতি ছিল। মেয়ের মা অথবা দিদিমা বন্দনা অনুষ্ঠানে ধান-দুর্বা দিয়ে আর্শীবাদ করেন। নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এই সময় তাঁদের দেয় যৌতুক দ্রব্যগুলো মেয়ের মায়ের হাতে তুলে দেন।

পরের দিন সকাল বেলায় মেয়ে জামাইকে বিদায় দেওয়া। বর-কনে বরের বাড়িতে পৌঁছালে সেখানেও উৎসবের ধুম পড়ে যায়। আগে এই অনুষ্ঠানেও রঙ খেলার রীতি ছিল। এছাড়া বর-কনেকে নিয়ে নাচেরও ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে বর-কনে নাচের রীতি কমে গিয়েছে। অনুষ্ঠানটি দায়সারা পর্যায়ের হয়। পরের দিন বরের বাড়িতে বর-কনের বন্দনা অনুষ্ঠান হয়। এবং বর পক্ষের সমস্ত অতিথিবৃন্দ যোগদান করেন। বৌভাত বলতে যা বোঝায় সেটা আগে হত দ্বিরাগমনের সময়। এখন ওই বন্দনার অনুষ্ঠানটাই বৌভাতের অনুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়।

বর্তমানে সরাকদের জাতীয় (সম্প্রদায়গত) দেবতা হলেন শিব। বিবাহের সময় শিবের নামে বাধ্যতামূলক ভাবে চাঁদা দেওয়ার রীতি আছে। এছাড়া সামাজিক মিলন ক্ষেত্রও রচিত হয় শিব মন্দির প্রাঙ্গনে। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরের কাছে দাপুনিয়া গ্রামে সরাকদের শিব মন্দির অছে। মন্দিরটি পাথর দিয়ে তৈরী। সামনে একটি ছোট পাহাড় আর ঈশরার পুকুর। এই পুকুর পাড়ে ঈশ্রা দেবীর মন্দির আছে। ঈশরাদেবী অনেকটা ষষ্ঠীদেবীর মত।

এখানে সরাকদের তিন থেকে ছয় মাসের ছেলে-মেয়েদের মানসিক (মানত) শোধ করা হয়। এই স্থানটা প্রকৃতির এক সুন্দর লীলাক্ষেত্র। গাছে গাছে অজস্র পাখিদের আস্তানা। সরাক মেয়েরা প্রকৃতির এই লীলাক্ষেত্রে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে যায়।

সরাক মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর রীতি আগে বড় একটা ছিল না। বর্তমানে অবশ্য সব মেয়েরাই স্কুল-কলেজে যাচ্ছেন। সরাক মেয়েদের ধীশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি বেশ প্রখর। বহু প্রাচীন সংস্কৃতির তাঁরা বাহিকা। তাঁরা আবার প্রচণ্ড রক্ষণশীল। তাই সমাজ জাতি ধর্ম সব কিছু অবক্ষয়ের পথে নেমে গেলেও এদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয় না। খালি পায়ে আর খালি হাতে এঁরা সেবা

নিয়ে শহরবাসেরও মন জয় করে নিতে পারেন। কিন্তু এঁদের দুর্ভাগ্য দেশের মানুষ এঁদের কথা জানবার চেষ্টা করেন নি।

আগেই বলেছি সরাকদের মধ্যে কেউ ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করেন না। আবার অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে এঁরা মোটেই অগ্রসর নয়। সরাকদের জনপ্রিয় পেশা হল শিক্ষকতা। বর্তমানে সরাকেরা আবার এক অসাধারণ প্রগতিশীল চরিত্ররূপেও পরিগণিত হয়ে থাকেন।

সরাক সমাজের মধ্যে বেশিরভাগ শিল্প শ্রমিক রয়েছে বর্ধমান জেলায়। এখানের সরাকদের আর্থিক অবস্থাও অনেকটা ভাল। এই জেলার সরাক পরিবারের শতকরা চল্লিশভাগেরও বেশি মানুষ দুর্গাপুর, আসানসোলের শিল্পাঞ্চলের নানা কারখানায় এবং কয়লা খনিগুলিতে কাজ করেন। অপরদিকে বাঁকুড়ার শতকরা ১০ জন এবং সাঁওতাল পরগণার শতকরা ২২ জন চাকুরীকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাঁকুড়া এবং সাঁওতাল পরগণার সরাকদের চাষ থেকে আয় অনেক কমে গিয়েছে।

কৃষিকাজে নির্ভরশীল পরিবারগুলোতে বেকার মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে পরিবার পিছু যে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ আগে ছিল ৩০ কুইন্টাল তা আজ কমে গিয়ে ১৮ কুইন্টালে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথা পিছু কৃষি জমির পরিমাণ কমে গিয়েছে। এই কারণে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া অঞ্চলের সরাকদের মধ্যেও চাকুরি করার প্রবণতা বাড়ছে। বর্তমানে বাঁকুড়া, বর্ধমান ও সাঁওতাল পরগণার সরাকদের জনসংখ্যা এবং তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি পরিসংখ্যান তুলে দিলাম।

জেলার নাম	পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা	শিক্ষিতের হার	মাথা পিছু বার্ষিক আয়
বর্ধমান	৪১১	৪২৩৫	১৭০২	৫৭১ টাকা
বাঁকুড়া	৬৩২	৭২১৬	১৬০৪	৩২৬ টাকা
সাঁওতাল পরগণা	২৫৪	২৬০৭	১০৭৪	৪৫১ টাকা

পরিসংখ্যানে দেখা যাবে বর্ধমান জেলায় সরাকদের শিক্ষিতের হার যেমন বেশি ঠিক তেমনি মাথা পিছু আয়ও বেশি। অপর দিকে বাঁকুড়ার সরাকদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। বাঁকুড়া, বর্ধমান ও সাঁওতাল পরগণাতে সরাকদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ ভাগ মানুষ বাস করে। অবশ্য এর সঙ্গে

ধানবাদ, রাঁচি ও উড়িষ্যার সরাকদের ধরা হয়নি। সরাকদের একটা বড় অংশই উড়িষ্যায় বাস করেন যাদের কোন পরিসংখ্যান নেওয়া হয়নি।[১৭]

পুরুলিয়ায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আর বীরভূম, মেদিনীপুর ও সিংভূম অঞ্চলে মোট সরাকদের মাত্র ১৫ শতাংশ বাস করেন। উড়িষ্যা বাদ দিয়ে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, মেদিনীপুর, সিংভূম জেলার সরাকদের জনসংখ্যার একটা জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান দেবার চেষ্টা করছি।

জেলার নাম	পুরুষ	নারী	শিশু	মোট
পুরুলিয়া	৬৯৪৪	৫৮২৩	৪৭৫৫	১৭৫২২
বাঁকুড়া	২৬১০	২১৩৫	২৩১১	৭২১৬
বর্ধমান	১৫১৪	১৫৭৭	১১১৪	৪২০৫
সাওতাল পরগণা	৯৬১	৭৮৫	৯৪১	২৬৮৭
বীরভূম	-	-	-	১৪৬
মেদিনীপুর	-	-	-	৪১৬
সিংভূম	-	-	-	৩৭৮৯
মোট	১২১০৯	১০৩২০	৯২০১	৩৫৯৮১

১৯৬২ সালে সরাক সমাজের কয়েকজন উৎসাহী যুবক বেসরকারীভাবে সরাক সমাজে জনগণনার কাজ চালিয়েছিলেন। তাঁদের গণনাকে ভিত্তি করে বলা যায় যে ১৯৬২ সালে সরাকদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৫,৯৮১ জন। আর ৩৫-৩৬ বছর পর এই জনসংখ্যার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান সরাকদের জনসংখ্যা হয়তো ৪০,০০০ পেরিয়ে যাবে।

আর একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে বীরভূম এবং মেদিনীপুরের সরাকেরা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এইসব স্থানের সরাকেরা নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রাখতে পারেননি। অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। আর একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে মানভূম অঞ্চলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে, সেই হারে সরাকদের জনসংখ্যা বাড়েনি। একশ থেকে দেড়শ বছর আগে মানভূমের জনসংখ্যা ছিল ১৭,৩৮৫ জন। এর মধ্যে সরাকদের সংখ্যা ছিল ১০,৪৯৬ জন।[১৮]

১৭. উড়িষ্যার সরাকদের নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
১৮. Mr. Gait's Census report.

এককালে মানভূম অঞ্চলে সরাকেরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। আজ অবিভক্ত মানভূম অঞ্চলের জনসংখ্যার তুলনায় সরাকেরা একেবারে নগণ্য। কেমন করে এটা হল ভাবলে অবাক হতে হয়। এককালে সিংভূম নাকি সরাকদের দ্বারা শাসিত হত, কিন্তু সিংভূম জেলায় সরাকদের খুঁজেই পাওয়া যাবে না আজ। এটাই যেন ইতিহাসের গতিপথ। পৃথিবীর ইতিহাসে কত চমকপ্রদ মানবগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। কত অসাধারণ সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছেন তাঁরা। আবার এক সময় মহাকালের গতিপথে হারিয়ে গিয়েছেন।

হারিয়ে যেতে বসেছেন সরাকেরাও। হারিয়ে যাচ্ছে তাঁদের অসাধারণ পুরাকীর্তির নিদর্শন। কত সুন্দর সুন্দর শিল্পকলা অনাদরে ভেঙে পড়ছে। কত সুন্দর মন্দির ভেঙে শিল্পকলায় সমৃদ্ধ পাথরগুলো দিয়ে মানুষের বাড়ি তৈরী হচ্ছে। মানুষের হাতে গড়া সভ্যতা মানুষের হাতেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা শুধু দাঁড়িয়ে দেখছি। জানিনা এরজন্য আমাদের উত্তর পুরুষদের কাছে কোনদিন কোন কৈফিয়ত দিতে হবে কিনা।

।। দুই ।।

সরাকদের গোত্র পিতা

মহাবীরের জন্মের আগেও এই অঞ্চলে সরাকেরা বসবাস করতেন এমন নিদর্শন আছে জৈন গ্রন্থে। সরাকেরা কতদিন থেকে এই অঞ্চলে বসবাস করছেন সে প্রসঙ্গে আজও কোনরূপ গবেষণামূলক আলোচনা হয়নি। এ প্রসঙ্গে কোন গ্রন্থও প্রকাশিত হয়নি। তবে আমরা মহাবীরের জীবনী হতে জানতে পারি যে তিনি যখনই আরক্ষ কর্মের দ্বারা ধৃত, নির্যাতিত হয়েছেন তখন পার্শ্বাপত্যায় সাধ্বীদের দ্বারা সুরক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন, এতে মনে হয় মহাবীরের পূর্বে সেখানে পার্শ্ব ধর্মপ্রচার করেন। তখনই সরাকেরা তাঁকে মুক্ত করেছেন।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে সরাক শব্দটি জৈন শ্রাবক শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ শ্রোতা। এই প্রসঙ্গে হারবার্ট রিশলে বলেছেন- Their name is variant of sravaka (Sanskrit hearer) the designation of the Jainlaity.

আর্য সাহিত্য শ্রীমদ্ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধ চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই তিনটি অধ্যায়ে ভগবান ঋষভদেবের কথা আছে। এই গ্রন্থে ঋষভদেবকে ব্রহ্মের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। সরাক জাতির এই মহান গোত্রপিতার শত পুত্রের মধ্যে ঋষভদের ১০০ পুত্রের মধ্যে ৯৮ জন দীক্ষিত হন (জৈন মতে)। ঋষভ বংশজ সরাক জাতির মধ্যেও পূর্বে ব্রাহ্মণের মত উপবীত ধারণ করার রীতি ছিল। উড়িষ্যার কিছু কিছু অঞ্চলে এখনও উপবীতধারী সরাকদের সন্ধান পাওয়া যায়।

তাঁরা এখনও পৌরোহিত্য করেন। জৈন সংস্কৃতিতে উপবীতধারণ করার রীতি সু-প্রাচীন। পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত বহু জৈন শিল্পকলায়-এর নিদর্শন আছে। এছাড়া সরাকদের বিবাহে কুসুণ্ডিকা ও হোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এগুলি আর্য সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন। তাই সরাকেরা আর্য্য গোষ্ঠী থেকে আগত বললে মনে হয় ভুল হবে না।

কিছুদিন আগে অজয়ের তীরে পাহাড়পুর গ্রামে সিন্ধু সভ্যতার একটি মাতৃ মূর্তির মস্তক পাওয়া গিয়েছে।[১৯] এই মূর্তি সিন্ধু সভ্যতার একটি নিদর্শন। হয়তো আর্য্য গোষ্ঠীর কোন শাখা সুদূর সিন্ধু প্রদেশ থেকে এই অঞ্চলে এসেছিলেন। সম্ভবতঃ এরা ঋষভ বংশজ সরাগ বা সরাক সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন।

আগেই বলেছি এখানের সরাকেরা শিবের উপাসক। শিব মন্দিরই হল তাঁদের সামাজিক মিলন স্থল। ঋষভ বংশজ সরাকদের শিব ভক্ত হওয়াতে কোনরূপ হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব নেই। যেমন উড়িষ্যাতেও ঋষভদেব আমাদের মহাদেবের মত হলেন আদিদেব কৈলাস পর্বত দেবাদিদেব মহাদেবের লীলাক্ষেত্র। কৈলাস পর্বত আবার আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবেরও নির্বাণভূমি। ঋষভদেব এখানে যেন মহাদেবে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন। তিব্বতীরা ঋষভদেবকে ধর্মপাল বলে। তিনি হলেন কৈলাসের অধিষ্ঠাতা দেবতা। এই দেবতার পরণে বাঘছাল, গলায় নরমুণ্ডের মালা আর এক হাতে ডমরু অপর হাতে ত্রিশূল। শিবেরই এটা যেন অভিন্নরূপ। উড়িষ্যাতে বহু শিব মন্দিরে ঋষভনাথকে শিবরূপে পূজো করা হয়। পুরুলিয়াতেও বহু তীর্থঙ্কর মূর্তি শিব মন্দিরে পূজো পাচ্ছে। শিব স্থানীয় দেবতা ভৈরবনাথ বা মহাকাল ভৈরব তীর্থঙ্কর মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং সরাকদের শিব পূজার মধ্যে গোত্রপিতা ঋষভনাথের পূজোই নিহিত আছে।

।। তিন ।।

প্রাচীন অর্থনীতিতে সরাকদের ভূমিকা

সরাকেরা শিল্পীর জাত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই নানা ধরণের শিল্পকর্মে তাঁরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ভাস্কর্য শিল্প, লৌহ শিল্প, তাম্র শিল্প এবং বস্ত্র শিল্প এই চাররকম শিল্পেই তাঁরা বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। সেকালের লৌহ শিল্প, তাম্র শিল্প আর বস্ত্র শিল্প সরাসরিভাবে দেশের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভাস্কর্য শিল্প দেশের মানুষের ধর্ম এবং সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল বেশি। অবশ্য ভাস্কর্য শিল্পের সঙ্গে তৎকালীন দেশের অর্থনীতির কোন যোগ ছিল না এমন কথা বলা যায় না। পুরুলিয়া অঞ্চলের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই অঞ্চলের সমস্ত পুরাক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে তাম্রলিপ্ত বন্দরের যোগাযোগ ছিল।

১৯. এই মূর্তিটি শ্রমণ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত শ্রী হরিপ্রসাদ তেওয়ারীর কাছে রক্ষিত আছে।

চন্দ্রপ্রভ, দিনাজপুর

জৈনমূর্তি, সূর্যপাহাড়, আসাম

পার্শ্বনাথ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

পাড়ার প্রাচীনতম সরাক জৈন মন্দির

পার্শ্বনাথ, বর্ধমান

তখন পূর্বাঞ্চলে তাম্রলিপ্ত বন্দরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাম্রলিপ্ত থেকে পাটলিপুত্র যাওয়ার দুটো স্থায়ী রাস্তা গড়ে উঠেছিল। প্রথম রাস্তাটি ঘাটাল, বিষ্ণুপুর, ছাতনা, রঘুনাথপুর, তেলকূপী, ঝরিয়া, রাজগীর হয়ে চলে গিয়েছিল পশ্চিম দিকে। তখনকার দিনে ঘাটাল, বিষ্ণুপুর, ছাতনা ও রঘুনাথপুর এই চারটি স্থানই তসর শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। আর তেলকূপী ছিল এক শিল্প নগরী।

তমলুক বা তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে আর একটি রাস্তা পাকবিড়রা, বুধপুর, মানবাজার, বরাহবাজার, দুলমী, সাফারান, বোড়াম, সুইসা প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়ে বেনারসের দিকে চলে গিয়েছিল। পাকবিড়রা, বুধপুর, মানবাজার, বরাহবাজার, দুলমী, বোড়াম, সুইসা প্রভৃতি স্থানগুলো সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত পুরাক্ষেত্র। এইসব পুরাক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ তীর্থঙ্কর মূর্তি, দেবদেবীমূর্তি ও অন্যান্য নারী মূর্তি তৈরী হত যা কিছু কিছু বিদেশে রপ্তানী করার জন্য তাম্রলিপ্ত বন্দরে আনা হত। পাকবিড়রায় প্রচুর পরিমাণ একই ধরণের মূর্তি একই স্থানে পাওয়া গিয়েছে। মূর্তিগুলো একেবারে নতুনের মত আছে। এখানে মূর্তি নির্মাণের কেন্দ্র (workshop) ছিল বলে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে।

শিল্পীদের কোন জাত হয় না। সরাক শিল্পীরা যে জৈন মূর্তি ছাড়া আর কোন ধরণের মূর্তি নির্মাণ করতেন না এমন কথা বলা যায় না। পাকবিড়রার পাশেই বুধপুর বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রভূমি ছিল। বুধপুরে বেশ কিছু গণেশ মূর্তি ও বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এগুলো নাকি আগে পাকবিড়রায় ছিল। এখানের ভাস্কর্য শিল্প তাম্রলিপ্ত বন্দরে যেত বলেই এই ধরণের একটা রাস্তারও প্রয়োজন হয়েছিল।

আগেই আমরা দেখেছি যে ধাতু যুগের প্রথম পর্ব থেকেই এই অঞ্চলে সরাকদের বসবাস ছিল। সিংভূম অঞ্চলে সরাকদের প্রচেষ্টায় এক সমৃদ্ধ তাম্র যুগের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কলোনেল Mr. Haughton একটি রচনায় সর্বপ্রথম সিংভূম জেলার প্রাচীন তামার খনিগুলোর কথা প্রকাশ করেন। এরপর মিস্টার ভি. বল (Mr. V. Ball) ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সিংভূম জেলায় বিশেষ অনুসন্ধান চালান। তিনি পাহাড়ে, পর্বতময় অঞ্চলে, গভীর জঙ্গলে এমনকি ধানের ক্ষেতে পর্যন্ত প্রাচীনকালের তামার খনি দেখতে পান। তিনি তামার খনিগুলো পর্যালোচনা করে বুঝতে পারেন যে যাঁরা এগুলো ব্যবহার করতেন তাঁদের কারিগরি জ্ঞানের অভাব ছিল না। মিস্টার ভি বলের মতে এখানকার সরাকেরাই সিংভূম-মানভূম অঞ্চলের তাম্রখনিগুলোর সৃষ্টিকর্তা। তিনি লিখেছেন—

The more adventurous seraks or lay Jains hearing alone penetrated the jungles where they were rewarded with the discovery of copper upon the working of which they must have spent all their

time and energy as with the exception of the tanks above mentioned, the mines furnish the sole evidence of their occupation of that part of the country.[২০]

মিস্টার বলের মতে প্রাচীন সরাক জাতির মানুষেরা স্মরণাতীত কাল থেকেই তাম্র শিল্পে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে এই তাম্রখনির মালিকানা নিয়েই ছোটনাগপুরের হো জাতির মানুষদের সঙ্গে সরাকদের বিবাদ বেঁধেছিল। অনেক ঐতিহাসিকের মতে সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ আক্রমণের মধ্যেও সিংভূম অঞ্চলের তাম্র শিল্প করায়ত্ব করার পরিকল্পানা ছিল।

এককালে সমস্ত সিংভূম জেলা সরাকদের দ্বারাই শাসিত হয়েছে। একথা স্মরণ রেখে মেজর টিকেল (major Tickell) বলেছেন- Singhbhum passed into the hands of the sarawaks. সিংভূম জেলা ও এর পাশাপাশি অঞ্চলে অর্থনৈতিক এবং নৃতাত্ত্বিক যেসব কাগজ পত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করলেও বোঝা যায় যে এককালে সিংভূম সরাকদের দ্বারা শাসিত হত।

সরাকেরা কেবল মাত্র তাম্রযুগের প্রবর্তকই ছিলেন না, তাঁরা এই অঞ্চলের লৌহ যুগেরও প্রতিষ্ঠাতা। অজয় নদীর উভয় পার্শে রূপনারায়ণপুর থেকে পাণ্ডবেশ্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ৯০ মাইল অঞ্চলের পর্বত প্রমাণ লৌহ স্তুপ ও লৌহ চুল্লির সঙ্গে সরাক সম্প্রদায়ের মানুষেরা জড়িত ছিলেন সেকথা বলা যায়।

সরাকেরা বস্ত্র শিল্প মধ্যযুগের অর্থনীতিকে কতটা প্রভাবিত করেছিল বলা কঠিন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে সরাকেরা নিজেদের আবাস থেকে বিতাড়িত হয়ে বস্ত্র শিল্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমত অবস্থায় তাঁদের বস্ত্র শিল্প দেশের অর্থনীতির উপর বড় রকমের প্রভাব রেখেছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু কবিকঙ্কণ চণ্ডীর যুগে সরাকদের বস্ত্র শিল্পের যে তথ্য আমরা পেয়ে থাকি তা কিন্তু দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে নগণ্য নয়। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যখন বলেন- "পাইয়া ইনাম বাড়ি, বুনে নেত পাট শাড়ি দেখি বড় বীরের হরিষ।" তখন সরাকদের পাট ও নেত শিল্পকে ছোট করে দেখা যুক্তিযুক্ত হবে না। বিষ্ণুপুর ও রঘুনাথপুর দীর্ঘদিন থেকেই পাট ও নেত বা তসর শিল্পের জন্য বিখ্যাত। বিষ্ণুপুরে সরাক বস্ত্র শিল্পীরা আজও তসর ও সিল্ক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন। অতীতে এই দুই অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণ তসরের কাপড় দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা হত। এমনকি এইসব বস্ত্র দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশেও রপ্তানী করা হত। এই কারণেই রঘুনাথপুর ও বিষ্ণুপুর তাম্রলিপ্ত বন্দরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাম্রলিপ্ত

২০. On the Ancient Copper Miners of Singhbhum.

থেকে একটি রাস্তা ঘাটাল, বিষ্ণুপুর, ছাতনা, রঘুনাথপুর, তেলকূপী হয়ে পাটলিপুত্রের দিকে চলে গিয়েছিল।

সরাকদের বস্ত্র শিল্পে যে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর যুগে রাজা-মহারাজারাও খুশি ছিলেন সে কথা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীও স্বীকার করে গিয়েছেন। যে শিল্প দেশের রাজাকে খুশি করতে পারে তার প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে পড়েনি এমন কথা বলা যায় না।

বর্তমানকালে সরাকদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মানুষেরা দেশের অর্থনীতির উপর কোন প্রভাব রাখবেন এমনটা আশা করা যায় না। তবু পুরুলিয়ার পাঁচেত অঞ্চলের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে সরাকদের কিছুটা ভূমিকা আছে। পাঁচেত অঞ্চলের বেশিরভাগ কৃষি জমিগুলোই এখন সরাকদের দখলে। প্রগতিশীল চাষী হিসেবে জেলায় তাঁদের একটা নাম-ডাক আছে। এককালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন উৎপাদিত ফসলের উপর লেভি ধার্য করেছিলেন তখন এই প্রথায় বেশিরভাগ ধান সংগৃহিত হত সরাকদের বাড়ি থেকেই।

।। চার ।।

সাহিত্য, সংস্কৃতি, কাহিনী ও কিংবদন্তী ও মেয়েলি ছড়া গানে সরাকদের অবদান

মধ্যযুগের সাহিত্য সংস্কৃতিতে সরাকদের বেশ কিছুটা অবদান রয়েছে। কিছুদিন আগে "কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু" নামে একটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রন্থটি পাওয়া গিয়েছে পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে। এর রচয়িতা জগৎরাম রায়ের পুত্র রামপ্রসাদ রায়। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে রাণীগঞ্জ টি. ডি. বি. কলেজের অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আছে। তিনি এই গ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এই প্রাচীন গ্রন্থটিতে রামদুলাল সরাকের নাম পাওয়া যায়। রামদুলাল সরাক সম্ভবতঃ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই শ্রী রাধাচরণ তন্তুবায় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন। এই অঞ্চলের সরাকেরা যে প্রচীন সাহিত্য নিয়েও ভাবনা চিন্তা করতেন কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু তারই প্রমাণ। এছাড়া শ্রী ধরম সিং (সরাক) এর হস্তাক্ষরে শ্রীরূপ সনাতন সংবাদ ও উপাসনা নামক একটি গ্রন্থের খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি আমার সংগ্রহশালায় আছে। পাণ্ডুলিপিটি ১১৯১ সালের ১৫ই ফাল্গুন শেষ হয়েছিল। গ্রন্থটি সম্ভবতঃ শ্রীতত্ত্ব সার নিরূপণ নামক গ্রন্থের অংশ বিশেষ। গ্রন্থটির লেখক অকিঞ্চন দাস। ভণিতায় রয়েছে—

গোপিগণ জাঙ্খিয়া চাহিল গুণরাসি।
অকিঞ্চন দাস বলে হব গোপির দাসী।।

এই দুটি গ্রন্থ থেকে সরাকদের একটি মূল্যবান তথ্য আমরা পেতে পারি। সেটা হল, যে মধ্য যুগে অর্থাৎ কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু রচনার যুগে সরাকদের কোন পদবী ছিল না। তাঁরা নিজেদের সরাক বলেই পরিচয় দিতেন বা নামের শেষে সরাক শব্দটাই দিতেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই রামদুলালের নাম রামদুলাল সরাক পাওয়া গিয়েছে। অপর দিকে ১১৯১ সালের (বাংলা) পরবর্তী সময়ে সরাকদের সিং পদবী দেখা যাচ্ছে। সুতরাং সরাকদের পদবী লাভের ঘটনা সম্ভবতঃ ১১৯১ বাংলা সালের আগেই ঘটেছিল। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর একটি সরাক প্রভাবিত অঞ্চল। এখানের নতুনডি গ্রামের হরিশচন্দ্র সরাক (মাঝী) এককালে দুটি গ্রন্থ রচনা করে খুব সুনাম পেয়েছিলেন। প্রথমটি গীতিকাব্য, নাম শ্রীতীর্থঙ্কর গীতাবলী। দ্বিতীয়টি গদ্য গ্রন্থ, নাম শ্রাবকাচার। হরিশচন্দ্রের তীর্থঙ্কর গীতাবলী খুব সহজ সরল ভাষায় লেখা গীতি কবিতা। যেমন নমিনাথ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন-

এমনি তোমার নখের জ্যোতি,
হেরে মোহে কত যুবতী-
নুয়ে প্রণাম করতে গেলে,
ঠেকে তোমার নখের মুড়ি।
তোমার একটি ছিল খুড়তুতো ভাই,
সারাটি দিন চরাতো গাই,
সেটি পাক্কা চোর তার গুণের বালাই,
ভঙ্গিতে লোকের ননীর হাঁড়ি।।

সরাক সংস্কৃতিকে নিয়ে এই অঞ্চলে বেশ কিছু কাহিনী-কিংবদন্তী ও মেয়েলি ছড়া গান শোনা যায়। সরাক প্রভাবিত অঞ্চল পাড়া থানার পাড়া নামক গ্রামটি অতীতের সরাক সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। এই গ্রামের পুকুর পাড়ে আছে প্রাচীনকালের এক বিখ্যাত মন্দির। সম্ভবতঃ পুরুলিয়া জেলার সবচাইতে প্রাচীন মন্দির হল সরাকদের তৈরী এই কালো পাথরের মন্দিরটি। আগে মন্দির গায়ে মূল্যবান অলঙ্করণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। এখানে এক কিংবদন্তী আছে। বলা হয়েছে যে পাড়ার এই মন্দিরে নাকি রঙ্কিনী ও ঝঙ্কিনী নামে দুই রাক্ষসী বাস করত। সম্ভবতঃ এই রঙ্কিনী ও ঝঙ্কিনী যক্ষিণী ছিল। এই যক্ষিণীরা প্রাচীন শ্রাবক সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত ছিল। পশ্চিমবাংলার অন্যান্য স্থানেও রঙ্কিনী-ঝঙ্কিনীদের কথা শোনা যায়। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে তীর্থঙ্করের সঙ্গে যক্ষিণীর বিয়ের গল্প কথা শোনা যায়।

যাই হোক, পাড়ায় এই রঙ্কিনী-খড়্গিনী প্রসঙ্গে বহু অপপ্রচারমূলক গল্প গড়ে উঠেছে। কথিত আছে যে এই দুই রাক্ষসীকে নাকি নরমাংস খাওয়ান হত। এখানে নাকি একটি পাথরের তৈরী ঢেঁকি ছিল। এই ঢেঁকি দিয়ে নরমাংস কুটা হত। গ্রামের লোকেরা পালা করে রঙ্কিনী-খড়্গিনীর মন্দিরে নরমাংস সরবরাহ করত। আর সেই কারণেই নাকি এখানের মন্দিরে নরবলি দেওয়ার রীতি গড়ে উঠেছিল। এই কাহিনী নিশ্চয়ই আষাঢ়ে গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্ভবতঃ সাধারণ মানুষেরা যাতে জৈন মন্দিরে না যায় বা মন্দিরটি অনাদরে অবহেলায় ক্ষয় হয়ে যায়- সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা এইসব অপপ্রচার চালিয়েছিলেন।

রঙ্কিনী-খড়্গিনী রাক্ষসীর সঙ্গে এই অঞ্চলের এক বালিকা বধূর কাহিনী যুক্ত হয়েছে। এই বালিকা বধূর নাম ঝিঙা বৌ।[২১] অল্প বয়েস ভাব হয়েছে এক বাগাল বা রাখাল বালকের সঙ্গে। বালিকা বধূ সময় সময় বাগাল বন্ধুর কাছে ছড়া কাটে আর হেঁয়ালিতে কথা বলে। তার ছড়ার ভাষায় থাকে গোপন প্রেমের রহস্যময় মনের কথা-

বাগাল বন্ধু বাগাল বন্ধু,
ঘুরছ বনে বনে।
একটি গাছে একটি পাতা,
দেখেছ কোনখানে।।

একটি গাছে একটি পাতা অর্থাৎ বাঘের ছাতা। তাই অবাক হয়ে বাগাল বন্ধু জবাব দিয়েছে-

ঝিঙা বৌ ও ঝিঙা বৌ,
কেমন তোমার মতি।
সরাক জাতি কোন কালে,
খায় না বাঘের ছাতি।।

সুতরাং বাগাল বন্ধু কেন বাঘের ছাতা আনতে যাবে? ঝিঙা বৌয়ের মনের কথা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে ঝিঙা বৌ নিষিদ্ধ জিনিস চাইছে। বাগাল বন্ধু জানতে চায় যে ঝিঙা বৌ আরও কিছু চায় কিনা। এবার ঝিঙা বৌ বলেছে-

বাগাল বন্ধু বাগাল বন্ধু,
যাবেরে অনেক দূর।
মনে করে আনবে বাগাল,
শতদল কমলের ফুল।।

২১. কাহিনীর সংগ্রহের সূত্র।

এই প্রেমিক বাগাল বন্ধুকে ঝিঙা বৌয়ের শ্বশুর বাড়ির লোকেরা কৌশলে বলি দিয়ে তার মাংসে রঙ্কিনী ও ঝঙ্কিনীকে দেবার পরিকল্পনা করেছিল। সেদিন গোয়াল ঘরে ঝিঙা বৌয়ের ভাসুর ঝিঙা বৌয়ের গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ তার ধারণা ছিল যে ঝিঙা বৌ তাদের পরিকল্পনার কথা বাগাল বন্ধুকে বলে দিতে পারে। এই সময় বাগাল বন্ধু বাঁশী বাজিয়ে ঝিঙা বৌকে ভাত দেবার ইঙ্গিত করলে ঝিঙা বৌ বলল-

যখন বাগাল বাঁশী বাজায়
তখন আমি হেঁইশালে।
কি করে ভাত দিব বাগাল,
বড় ভাসুর গোয়ালে।।

শেষ পর্যন্ত ঝিঙা বৌয়ের কাছে পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে যায়। সে একথা বাগাল বন্ধুকে না জানিয়েও নিজের জীবনের বিনিময়ে বাগাল বন্ধু প্রাণ রক্ষা করে। আর বাগাল বন্ধু সে দৃশ্য দেখে পাষাণ হয়ে যায়। যে স্থানে বাগাল বন্ধু পাষাণ হয়েছিল সেই স্থানটার নাম বাগালিয়া। বর্তমানে এই বাগালিয়া- দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা পুরুলিয়ার একটি মধ্যবর্তী স্টেশন।

এই অঞ্চলের সরাকদের ভাস্কর্য শিল্প ও মন্দিরগুলোর উপর একদিন যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয়েছিল তার নিদর্শন যেমন পুরাক্ষেত্রগুলোর পাষাণ ফলকে রক্ষিত আছে ঠিক তেমনি কিছু কিছু লোক সঙ্গীতেও একথার স্বীকৃতি রয়েছে। মধ্যযুগে কালুবীরের ছদ্মনামে কোন এক দুর্ধর্ষ হানাদার এই অঞ্চলের অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে সরাকদেরও আক্রমণ করেছিল। প্রাচীন টুসু গানের এক ছড়ায় বলা হয়েছে-

কালুবীর কালুবীর বিজয় আগমন,
সরাক পাড়াতেরে দিলেক দরশন।
সরাকদের একে একে মারল ধরিয়া,
সরাকদের হাল জোয়ালটা রইল পড়িয়া।।

চাষীদের হাল জোয়ালকে হরণ করার ক্ষমতা কারুর নেই, কারণ-

ঈশ্বরে শিরিজল
হাল জুয়াল গো
মহাদেব শিরিজিল গাই।।

যাইহোক, এই কালুবীরকে অনেকে কালা পাহাড় বলে মনে করেন। তবে এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়নি। ছড়াটিতে অত্যাচারের যে ভয়াবহ চিত্র তুলে

ধরা হয়েছে তা সরাকদের অতীত জীবনের সঙ্গে যেমন করে মিলে যায় তেমন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের অতীত কাহিনীর সঙ্গে মেলে না। আর একটি টুসু গানের মেয়েলি ছড়ায় সরাকদের অতি সুন্দরী বৌয়ের প্রতি হিংসে প্রকাশ করা হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সরাকদের The remnant of an archaic বলেছেন। একথার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যাবে পুরুলিয়ার প্রাচীন ভাদু গানে। সরাক মেয়েদের প্রধান লোক উৎসব হল ভাদু। আমাদের প্রাচীন ভাদু গানে প্রচুর পরিমাণ জৈন গ্রন্থ বসুদেবহিণ্ডী, পদ্মচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের কাহিনীর ছাপ আছে।[২২]

এই জেলার ভাদু গানে সরাক মেয়েদের অবদান সবচেয়ে বেশি। সরাক মেয়েদের ভাদু গানে রাবণ ভগ্নি শূর্পনখাকে অতুলনীয়া রূপবতী বলা হয়েছে- রাবণ ভগ্নি শূর্পনখা, অতুলনীয় রূপ যাহার। ভাদু গানে শূর্পনখার হাতের নখের প্রশংসা করা হয়েছে। এটি অবশ্যই জৈন প্রভাব। জৈন রামায়ণে শূর্পনখা সুন্দরীর নাম চন্দ্রনখা।

এই অঞ্চলের ভাদু গানে রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়ে ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়কেই রাজা করা হয়েছে। গানে বলা হয়েছে "তোদিগে করেছি রাজা রামে দিয়ে নির্বাসন। এখানেও ভরত ও শত্রুঘ্নকে মিলিয়ে রাজা করার ঘটনায় জৈন রামায়ণের প্রভাব পড়েছে। জৈন গ্রন্থকার সংঘদাসের বসুদেবহিণ্ডীর চতুর্দশ খণ্ডে যে রামকথা আছে তাতে বলা হয়েছে যে ভরত ও শত্রুঘ্ন একই মায়ের গর্ভজাত দুই ভাই। তাদের মায়ের নাম কৈকেয়ী। সরাক মেয়েদের ভাদু গানে দেখা যায় যে বালি রাজা মৃত্যুর আগে উমা এবং তারা নামে দুই মেয়েকে রামচন্দ্রের হাতে দিয়ে শান্তিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। ভাদু গানে আছে-

শ্রীরামের শরে বালি রাজা মরে
সুগ্রীবে দেন সিংহাসন।
উমা তারা লয়ে আনন্দিত হয়ে
পার কর নারায়ণ।।
আমি মরি রাম যাই স্বর্গধাম,
তুমি অধম তারণ
ভাদু সঙ্গীত রসে কাশীনাথ ভাষে,
দেখিতে যুগল মিলন।।

"উমা তারা লয়ে" "পারকর নারায়ণ" ইত্যাদি কথার তাৎপর্য কি? তারা সুগ্রীবের স্ত্রী কিন্তু উমা কে? উমা কি প্রক্ষিপ্তভাবে এসে পড়েছে? আমার মনে হয় এখানে সবচেয়ে বেশি জৈন প্রভাব পড়েছে। জৈন রামায়ণ পউমচরিয় বা পদ্মচরিত্রে রামচন্দ্র বালী বধের পর এখানে তিনটি কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন।

২২. এ প্রসঙ্গে আমার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ "ভাদু গীতির ইতিকথায়" বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

তাছাড়া জৈন রামায়ণের ভক্তিবাদ সীমান্ত বাংলার ভাদু গানকে এক অলৌকিক শান্ত রসে ভরে দিয়েছে।

সরাক মেয়েদের সংস্কৃতিগত আর এক কৃতিত্ব হল তাঁদের দেওয়াল চিত্র। পুরুলিয়ার গ্রামের সরাকদের বাড়িগুলো চেনা যাবে তাঁদের দেওয়াল চিত্র দেখেই। পূজোর সময় সরাক মেয়েরা জল-রঙ ও পিটুলি দিয়ে এক বিশেষ ধরনের দেওয়াল চিত্র এঁকে থাকেন। এর মধ্যে থাকে বেশ কিছু জটিল চিত্র। এগুলো হল- সপ্তটি বর্গক্ষেত্রের উপর নাগ সাপ, ছয়টি বৃত্ত দ্বারা অঙ্কিত পদ্ম, বাগান বেড়ে দুর্গ বেড় প্রভৃতি। ঘরের দরজার ও জানালার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও বেশ সুন্দর করে সাজান হয়। এমন কোন সরাক বাড়ি পাওয়া যাবে না যে বাড়ির মেয়েরা দেওয়াল চিত্র আঁকে না। শিল্পকলার বীজ যেন সরাক মেয়েদের রক্তের মধ্যে নিহিত আছে। তাই গ্রামাঞ্চলের লেখা পড়া না জানা মেয়েও বুক ফুলিয়ে বলেন,- আমি লিখতে পারি। অর্থাৎ মেয়েটি দেওয়াল চিত্র আঁকতে পারে।

সরাকদের বিয়ের সময় এক ধরণের লোক সংস্কৃতিমূলক দেওয়াল চিত্র আঁকার রীতি আছে। এই ধরণের চিত্রের উপরের দিকে বর-কনে, বরযাত্রী, কনের সহগামিনী, কাপাস গুটি বা ঝি, বাঁতি, কাজললতা, কলাগাছ, মানগাছ প্রভৃতির রেখা চিত্র আঁকা হয়। ছেলের বিয়েতে বর-কনের চিত্রের নীচে ছয়টি বৃত্ত সহযোগে আঁকা পদ্ম ও মেয়ের বিয়েতে পুকুর আঁকা হয়। এই চিত্রের সামনে ধান-দুর্বা দিয়ে বর-কনেকে আশীর্বাদ করা হয়। এই চিত্রটি অন্তত ছয় মাস দেওয়ালে যত্ন করে রাখা হয়। এই ধরণের দেওয়াল চিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর লোক ভাবনা। এগুলো এক ধরণের নিখুঁত লোক শিল্প।[২৩]

সরাক মেয়েরা শিল্পীর জাত। পৌষ পরবের পিঠেতেও এঁরা শিল্পী মনের পরিচয় দেন। পৌষ সংক্রান্তির পিঠে পরব পুরুলিয়ার সরাক বাড়িতে জমে ওঠে। এঁদের বানানো পিঠেতেও রয়েছে লোক শিল্পের ছাপ। সরাক মেয়েরা নানা ধরণের জ্যামিতিক আকারের পিঠে বানিয়ে শিল্পকে লোক সংস্কৃতির একটা অঙ্গ করে গড়ে তুলেছেন।

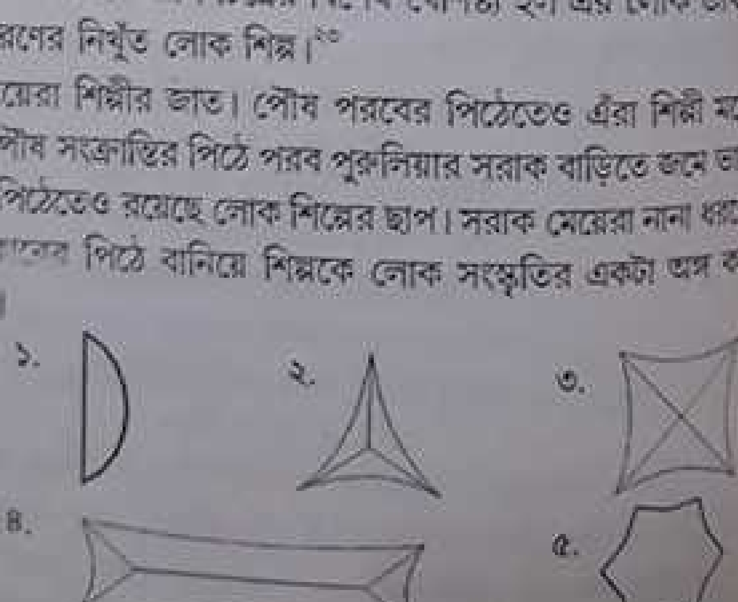

২৩. এই গ্রন্থের সঙ্গে এই দেওয়াল চিত্রের ছবি আছে।

জ্যামিতিক আকারে সরাক মেয়েদের গড়গড়ে পিঠে।[২৪] পৌষ পরবে সরাক মেয়েরা নানা আকারের গড়গড়ে পিঠে বানিয়ে থাকে। (১) কোন কোন পিঠেতে দুটো শৃঙ্গ থাকে। এগুলো হয় ঝিনুকের মতো লম্বা। এই ধরণের পিঠে পশ্চিম বাংলার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। (২) কোনও পিঠেতে তিনটে শৃঙ্গ থাকে। এগুলো দেখতে অনেকটা শিঙাড়ার মতো। (৩) আবার কোনও পিঠেতে চারটা শৃঙ্গ থাকে। এগুলো বর্গাকারে তৈরী হয়। (৪) চার শৃঙ্গ বিশিষ্ট আয়তাকার পিঠেগুলো একটু লম্বা হয়। (৫) যে সব পিঠেতে চার শৃঙ্গের বেশি শৃঙ্গ থাকে, সেগুলো অনেকটা ঘোল মাথানীর মতো গোল হয়। কি জানি এই গোলাকার পিঠেগুলোর সঙ্গে জৈন সংস্কৃতির ধর্ম চক্রের কোনও যোগ আছে কিনা। পৌষ সংক্রান্তিতে সারা বাংলার ঘরে ঘরে পিঠে হয়। কিন্ত এই পুলি পিঠের সঙ্গে সরাকদের গড়গড়ে পিঠের বেশি মিল নেই। যদিও এগুলো পুলি পিঠে ছাড়া আর কিছুই নয়।

সরাকদের বানানো পিঠে শিল্পকে বুঝতে না পেরে বা অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বহু বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। এমনি এক বিভ্রান্তি ছেপেছেন ডক্টর জয়ন্ত গোস্বামী তাঁর গবেষণা মূলক সমাজ চিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন গ্রন্থে। Census of India, Part -1, থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ওই গ্রন্থে বলা হয়েছে That they (Saraks) used cow made of rice paste (which they afterwards boiled) during some ceremonial observance (পৃষ্ঠা-৭৩৮)। বলা বাহুল্য তথ্যটি এত বিভ্রান্তিমূলক যে সরাকেরা শুনেই চমকে উঠেন। একটা সম্পূর্ণ নিরামিষাশী জাতের উপর এই কলঙ্ক লেপন শুধুমাত্র অন্যায় নয়, এটা চরম গর্হিত কর্ম। যে সব আয়তাকার গড়গড়ে পিঠেতে চারটে শৃঙ্গ থাকে সেগুলো দেখতে অনেকটা লেজ মুণ্ডহীন গরুর মত। কিন্তু একে গরু বলা আর সরাক মেয়েদের বানানো পিঠে শিল্পকে বুঝতে না পেরে এর অপব্যাখ্যা করা একই কথা। এরূপ মন্তব্য সরাক জীবন সম্পর্কে জয়ন্ত গোস্বামীর চরম অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে।

সরাকদের মধ্যে এমন কিছু প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যার জন্ম হয়েছে সরাক পরিবারেই। ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাভ করার পর থেকেই সরাক সমাজে গোঁসাই প্রথা প্রচলিত হয়। গোঁসাই ঠাকুর হলেন পরিবারের গুরু স্থানীয় ব্যক্তি। বছরে অন্তত কয়েকটা দিন করে গুরুদেবরা সরাক বাড়িতে কাটিয়ে যান। এ ছাড়া বিবাহ ও শ্রাদ্ধ বাড়িতে এঁরা গাই-বাছুর, ধুতি-চাদর প্রভৃতি গ্রহণ করে থাকেন। আবার অভাব পড়লেও গোঁসাই শিষ্য বাড়িতে এসে হানা দেন। কোন কাজ কর্ম ছাড়াই অনেক সময় এই গুরুদেব স্থানীয় মানুষদের জন্য সরাক পরিবারগুলোকে বেশ

২৪. সরাক মেয়েদের বানানো গড়গড়ে পিঠের আলোক চিত্র গ্রন্থের সঙ্গে থাকে।

কিছু টাকা খরচ করতে হয়। তাই অকারণে কিছু খরচ হলেই সরাকেরা বলে থাকেন– কোথাও কিছু নেই গোঁসাই এসেছেন। বাড়ি থেকে গোঁসাই তাড়ানোর একটি মজার ঘটনার কথা সরাক মেয়েদের মুখে শোনা যায়। গল্পটা এমন লোক কথার পর্যায়ে উঠেছে।

কোন এক গ্রামে এক সরাক দম্পতি বাস করতেন। চাষী পরিবার। অভাবের সংসার। শ্রমের অন্নে কোনরূপে দিন চলে যায়। কিন্তু তাঁদের খাবারে টান পড়ে যখন গোঁসাই ঠাকুর এসে তাঁদের পরিবারে বাসা বাঁধেন ও দিনের পর দিন থেকে যান।

সরাক বৌটি বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে গোঁসাইকে তাড়াবার একটা পরিকল্পনা করে ফেলল। স্বামীকে এ প্রসঙ্গে সে কিছুই বলল না। স্বামী তাঁর পরম গোঁসাই ভক্ত। তাই গোঁসাইকে সোজা পথে তাড়ানো যাবে না ভেবে সে বাঁকা পথ ধরল। একদিন সে গোঁসাইয়ের চোখের সামনেই তাদের বড় আকারের নোড়াটিতে তেল আর হলুদ মাখাতে লাগল। নোড়াতে কেউ তেল মাখায় না। ওটা দিয়ে বাটনা বাটা হয়। তাই গোঁসাই ঠাকুর জানতে চাইলেন, ওটাতে তেল মাখাচ্ছ কেন? বৌটি চোখ মুছে বলল,- আর বলবেন না গোঁসাই, ও কি যেন কার কাছে শুনে এসেছে। তাই আজ রাত্রেই এই নোড়া দিয়ে আপনাকে মেরে ফেলতে চায়। রক্তের দাগ যাতে নোড়াতে না বসে তাই আমি ওটাতে তেল হলুদ মাখিয়ে নিচ্ছি। আপনি যেন একথা কাউকে বলবেন না ঠাকুর। কথাটা শুনেই গোঁসাই ঠাকুর চমকে উঠলেন। ভাবলেন আর নয় বাবা, রাত হবার আগেই পালিয়ে যাই। তাই কাউকে কিছু না বলে গোঁসাই ঠাকুর পালালেন।

এদিকে বৌটির স্বামী ঘরে এসে গোঁসাই ঠাকুরকে না দেখে তাঁর কথা জানতে চাইলেন। বৌটি বলল,- গোঁসাই ঠাকুর আমাদের নোড়াটি চেয়েছিলেন। উনি নাকি ওটা দিয়ে শিব বানাবেন। এই দেখ তেল-হলুদ মাখিয়ে তিনি ঠাকুর বানিয়ে ফেলেছেন।

তুমি বুঝি নোড়াটা তাঁকে দিলে না? আর তাই বুঝি রাগ করে গোঁসাই চলে গেলেন।

স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে বৌটি চুপ করে থাকল।

বৌটির স্বামী তখন জানতে চাইলেন– ঠাকুর কতক্ষণে গেলেন? – এই মাত্র, জবাব দিল বৌটি।

সঙ্গে সঙ্গে বৌটির স্বামী নোড়াটি হাতে নিয়ে দৌড়াল। কিছুদূর যেতে না যেতে গোঁসাই ঠাকুরকে দেখা গেল রাস্তায়। বৌটির স্বামী চিৎকার করে বলতে লাগলেন– নোড়া নেন গোঁসাই, নোড়া নেন।

এদিকে গোঁসাই ঠাকুর তার শিষ্যকে নোড়া হাতে আসতে দেখে আরও ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন যে শিষ্য বুঝি নোড়া নিয়ে তাঁকে মারতেই ছুটে আসছে। তাই তিনি প্রাণ ভয়ে প্রাণপণে ছুট দিলেন। তাঁকে আর ধরা গেল না। বলা বাহুল্য গোঁসাই ঠাকুরের পাপ দৃষ্টি বৌটির উপর পড়েছিল। তাই তাঁর অপরাধী মন এতো ভয় পেয়েছিল। অপ্রিয় অতিথিকে তাড়াতে হলে সরাক মেয়েরা নিজেদের মধ্যেই বলে থাকেন,- নোড়া নেন গোঁসাই।

।। পাঁচ ।।

উড়িষ্যার সরাক সংস্কৃতি

সরাকেরা জৈন সম্প্রদায়ের একটি শাখা হলেও ভারতের অন্যান্য জৈন প্রভাবিত অঞ্চলে এঁদের দেখা যায় না। পশ্চিমবাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার কিছু অঞ্চলেই তাঁদের দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে স্যার হারবার্ট রিশলে বলেছেন-

A somewhat similar case is that of the saraks of Western Bengal, Chutea Nagpur and Orissa, who seems to be a Hinduised remnant of the early Jain People to whom local legends ascribe the ruined temples, the defaced images and even the abandoned copper mines.[২৫]

সুতরাং সরাকদের কথা কিছু বলতে গেলে উড়িষ্যার সরাকদের কথাও এসে পড়ে। এখানে যখন সরাকদের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছিল, যখন তাঁদের মন্দির ভেঙে ভাস্কর্য শিল্পকলা নষ্ট করা হয়েছিল তখন এখান থেকেও বেশ কিছু সরাক পরিবার উড়িষ্যায় পাড়ি দিয়েছিলেন। এমনকি অনেকে উড়িষ্যায় গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আগেই বলেছি যে সরাকদের সঙ্গে এখানের হো জাতির আদিবাসীদের প্রথম বিবাদ বাধে। প্রায় ২০০০ হাজার বছর আগে হো জাতির মানুষেরা সরাকদের বহু মানুষকে বিতাড়িত করে। সেকালে উড়িষ্যা সরাকদের পক্ষে ভয়হীন আশ্রয়স্থল বলে বিবেচিত হত।

সরাক সংস্কৃতির ক্রম বিকাশের ধারায় উড়িষ্যার একটি বিশেষ স্থান আছে। একসময়ে পার্শ্বনাথ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গতে জৈন ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে তিনি কলিঙ্গ অভিমুখে এসে জৈন ধর্ম প্রচার করার জন্য কোপ কটকে ধন্য নামক একজন গৃহীর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

---

২৫. The People of India (আমার এই আলোচনার বাইরে সারা ভারতবর্ষে আর কোথাও সরাক নামে কোন জাতি বাস করে না)।

এই কেপ কটক বর্তমানকালের বালেশ্বর জেলার কেপারি গ্রাম। পার্শ্বনাথের নামের সঙ্গে কলিঙ্গের প্রাচীন সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। উদয়গিরি, খণ্ডগিরি অঞ্চলে তাই অন্যান্য তীর্থঙ্করদের চাইতে পার্শ্বনাথের প্রচার ও গুরুত্ব বেশি দেখা যায়। সে সময় ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে কুসুম্ব নামে এক আঞ্চলিক উপজাতি বাস করত। তারা পার্শ্বনাথের ধর্মমত প্রচারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছিল।

মহাবীর স্বামীও এককালে কলিঙ্গে এসে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যায়। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে বলা হয়েছে Mahavira Vardhaman went to Kalinga as the King of that country was a friend of his father.[২৬] পিতৃবন্ধু কলিঙ্গ দেশের রাজা নাকি মহাবীর স্বামীকে ধর্ম প্রচারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সম্রাট খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপির ১৪তম লাইনে মহাবীর বর্দ্ধমানের কলিঙ্গ ভ্রমণের কথা আছে। মহাবীর প্রথমে কুমারী পর্বতে এসে ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন। মহাবীরের সময় কলিঙ্গ দেশকে জৈন ভূমি বলা হত।

এককালে কলিঙ্গ দেশে একটি বড় বন্দর ছিল। এই বন্দরটির নাম পিথুণ্ডি। জৈন ধর্মের প্রচারকবৃন্দ এই বন্দর দিয়ে ধর্ম প্রচারের কাজে দূর দেশে যেতে পারতেন। পরবর্তীকালে পিথুণ্ডি এক বড় ধরণের সরাক সংস্কৃতির তীর্থভূমি বলে পরিগণিত হত। এক সময় চম্পা রাজ্য থেকে এক বণিক পিথুণ্ডিতে এসে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। তিনি এখানে এক সুন্দরী নারীকে বিবাহ করে বেশ কিছুদিন সংসার ধর্ম পালন করার পর শ্রাবকাচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সম্রাট খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে পিথুণ্ডি শব্দটি পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে জৈন ধর্ম কলিঙ্গ রাজ্যের জাতীয় ধর্মের রূপ লাভ করে। চেদি বংশের রাজাদের আমলে জৈন ধর্ম সারা উড়িষ্যা অঞ্চলকে ভাসিয়ে নিয়েছিল। এমন কি হিউয়েন্ সাঙ্ যখন ভারতের পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন তখনও কলিঙ্গ দেশে জৈন ধর্ম কলিঙ্গের রাজধর্ম বলে বিবেচিত হত। এই সময় কেবল মাত্র উড়িষ্যাতেই না, গুজরাট, মারওয়াড় প্রভৃতি অঞ্চলেও জৈন ধর্ম জাতীয় ধর্ম বলে পরিগণিত হত। এ প্রসঙ্গে Imperial Gazetter of India-তে বলা হয়েছে, During the mediaeval period of India Jainism secured much political influence. It became the state religion of the Calukya prince of Gujarat and Marwar and the king of the Kara Mandal coast.[২৭]

২৬. হরিভদ্রীয় বৃত্তি।
২৭. Inperial Gazetter of India-pp-414-417.

উড়িষ্যার সম্রাট খারবেল মনে হয় জৈন ধর্মকে কয়েক হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখার জন্য খণ্ডগিরিতে ইতিপূর্বেই তাঁর অমর কীর্তি পাষাণ ফলকে অঙ্কিত করে গিয়েছেন। খারবেলের লিপি থেকে জানা যায় যে নন্দ বংশের রাজা মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ দেশ আক্রমণ করেছিলেন। এখানে তিনি শ্রাবকাচারের প্রতি আকৃষ্ট হন। কলিঙ্গ বিজয় শেষে মহাপদ্ম নন্দ এখান থেকে একটি জিন মূর্তি পাটলিপুত্রে নিয়ে যান। এরপর থেকে সম্ভবতঃ মহাপদ্ম নন্দ জৈন ধর্মের একজন উপাসক হয়ে পড়েন। এই জিন বা তীর্থঙ্কর মূর্তি তিনশত বৎসর পর্যন্ত পাটলিপুত্রে ছিল। পরে তা আবার কোন সময় কলিঙ্গ দেশে আনা হয়। সম্রাট খারবেলের সময় রাজপুরুষেরা এবং রাজ পরিবারের নর-নারীরা সকলেই সরাক আচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তীর্থঙ্করদের ব্যক্তিত্ব, ত্যাগ, আদর্শ প্রভৃতি রাজকর্মীদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। শিলালিপিতে খারবেলকে চক্রধর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উড়িষ্যার ইতিহাসে তিনি রাজ চক্রবর্তী ছিলেন। চক্র অর্থে শ্রাবক ধর্মকে বোঝান হয়।

সরাক সম্প্রদায়ের শান্তিধাম জৈন ভূমি এই উড়িষ্যা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সরাকেরা এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করেছেন। অনেক সময় তাঁরা যাযাবর শ্রেণীর মানুষের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। বালেশ্বর জেলায় অঘোরী বা অঘরী নামে একটি জাতের সন্ধান পাওয়া যায়।[২৮]

তাঁরা নাকি আগে সরাক ছিলেন। অনেকের মতে অঘোরী সম্প্রদায় অগ্রবাল সম্প্রদায় থেকে এসেছেন। ধলভূমের মহুলা গ্রামের দুই মাইল দূরে একটি অঞ্চলে আগে প্রচুর পরিমাণ সরাক সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন। উড়িষ্যা ও বিহারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শত বৎসর আগে সরাকদের একটি শাখা বাস করত। এই সব অঞ্চলে যে সব পুকুর, গুম্ফা প্রভৃতি দেখা যায়– তাতে প্রমাণ হয় যে এখানের সরাকেরা বেশ সম্পদশালী ছিলেন। এছাড়া হাসি গুড়, জোড়ি গুড়ি, দোল ডিহ, নয়া ডিহ, মোড়ন ডিহ প্রভৃতি অঞ্চলে কিছুদিন আগেও বহু সরাক সম্প্রদায়ের মানুষকে দেখা যেত। বর্তমানে তাঁদের অনেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

উড়িষ্যার কিছু অঞ্চলে নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণ সরাক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে এঁরা অরক্ষিত দাসপন্থী ও মহিমাপন্থী এই দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এঁদের পূর্ব পুরুষেরা হয়তো সরাক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

২৮. অঘরী অর্থাৎ যাদের ঘর নেই। এরা যাযাবর শ্রেণীর সরাক।

খণ্ডগিরি অঞ্চলে বহু প্রাচীনকাল থেকেই সরাকেরা বাস করে আসছেন। এখনও এই স্থান সরাক সম্প্রদায়ের তীর্থভূমি বলে পরিগণিত হয়। মাঘ শুক্লা সপ্তমীতে এখানে বিরাট মেলা বসে। সেদিন হাজার হাজার সরাক জাতির মানুষ জৈন সাধুদের সঙ্গে মিলিত হন।

ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জবংশীয় রাজারা অতীতে ধর্মের দিক দিয়ে শ্রাবক ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বীরভদ্র এক কোটি সরাক সাধুর গুরুদেব ছিলেন। এই বংশের অন্যান্য রাজারাও ভূমিহীন সরাক সম্প্রদায়ের মানুষকে বহু গ্রাম দান করেছিলেন। ভঞ্জ বংশের সৃষ্টির মূলেও সরাক সংস্কৃতির অবদান রয়েছে। তাঁদের বংশধারার সঙ্গে মিশে আছে শ্রাবকাচার। কথিত আছে যে এই বংশ ময়ূরের ডিম থেকে এসেছে। আর তাই এর নাম ময়ূরভঞ্জ বংশ। আবার এই ময়ূর সাধারণ ময়ূর নয়, এই ময়ূর হল শ্রাবক সংস্কৃতিমূলক পুরাণে বর্ণিত শ্রুতদেবীর বাহন। শ্রুতদেবী হলেন ময়ূরবাহিনী দেবী সরস্বতী।[২৯]

উড়িষ্যার সরাকদের বিভিন্ন ধরনের পদবী বা টাইটেল আছে। এই সকল পদবীর মধ্যে পাত্র, দণ্ড, সাঁতরা, বর্দ্ধন, মাহাত্র, দেবতা, প্রামাণিক, আচার্য, বেহারা, দাস, সাও, মণ্ডল, নায়েক, সেনাপতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সরাকদের এইসব পদবী কিভাবে এলো তার কোন ইতিহাস জানা যায় না। তবে পাত্র, মণ্ডল, নায়েক প্রভৃতি পদবী পশ্চিম বাংলার সরাকদের মধ্যেও দেখা যায়।

পশ্চিমবাংলার সরাক সম্প্রদায়ের মত উড়িষ্যার সরাক সম্প্রদায়ের কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই। রঙিনী সরাকী তাঁতীরা নিজেদের ব্রাহ্মণের চাইতে উঁচু জাত বলে মনে করেন। এই কারণে তাঁরা ব্রাহ্মণদের হাতে জল খান না। আগেই বলেছি পশ্চিমবাংলার সরাকদেরও আগে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিলেন। তাঁদেরও মধ্যে নিজেদের প্রসঙ্গে বেশ উঁচু ধারণা আছে। এখানের সরাক মেয়েরা ব্রাহ্মণদের বাড়িতেও ভাত খায় না। হয়তো ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অতীতের বাদ-বিবাদই উড়িষ্যা ও পশ্চিমবাংলার সরাকদের এইসব ধারণার জন্ম দিয়ে থাকবে। উড়িষ্যার সরাকেরা ডুমুর খান না। কারণ ডুমুরে নাকি পোকা হয়। পশ্চিমবাংলার সরাকেরাও ডুমুর খান না।

উড়িষ্যার সরাকদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই বলেই সময় সময় তাঁরা নিজেরাই পৈতা ধারণ করে পূজা বা বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে থাকেন। উড়িষ্যার সরাকদের বিবাহ ও অন্যান্য আচার-আচরণ নিয়ে দুটি গ্রন্থ আছে। একটি হল বিবাহকাণ্ড। আর অপরটি নাম হল শুদ্ধিক্রিয়া।

২৯. এই শ্রুতদেবী সরস্বতীকে পুরুলিয়ার পুরাকীর্তিতে দেখা যাবে।

সরাকী তাঁতিরা উড়িষ্যার বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। কটক জেলার ধালিয়া পাহাড়, খণ্ডিয়া পাহাড়, চন্দোড়, জাজপুর, রত্নগিরি, উদয়গিরি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর সরাক সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাস করেন। এছাড়া তিগিরিয়া, বড়ম্বা, বৌকি ও পুরি জেলার পিপ্‌লি প্রভৃতি অঞ্চলে সরাকদের প্রভাব রয়েছে।

করাপুর জেলার ভৈরব সিংহপুর, জয়পুর তালুকা প্রভৃতি অঞ্চলের ১৯৪১ সালের লোক সংখ্যা ছিল ১১৪১ জন। এর মধ্যে অধিকাংশই হলেন সরাক সম্প্রদায়ের মানুষ। এখানকার এক শিব মন্দিরে ঋষভ নাথের একটি মূর্তি আছে। এই মূর্তির গায়ে চাষীরা তাঁদের কুড়ুল জাতীয় অস্ত্র ধার দিয়ে থাকেন।[৩০] এই কারণে মূর্তিটি বর্তমানে ক্ষয়ে গিয়েছে।

আগেই বলেছি উড়িষ্যার সরাকদের মূল পেশা হল তাঁত শিল্প আর এই কারণেই তাঁদের তাঁতী বলা হয়। তবে এইসব সরাকেরা প্রাচীনকাল থেকেই যে তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। সরাকেরা বাঁচার তাগিদেই কাপড় বোনার কাজটাকে বরণ করে নিয়ে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মিস্টার রিশলের কথা স্মরণীয়।

In Orissa they (Saraks) call themselves Buddhists and assemble once a year at the famous Cave Temple of Khanda Giri near Cuttak to make offering to the Buddhists images there and to confer on religious matters.

But the survival of their ancient faith have not saved them from the all pervading influence of caste. They have split out into endogamous groups based partly on locality and partly on the fact that some of them have taken to the degraded occupation of weaving and now form a Hindu case of the ordinary type.[৩১]

রিশলের রচনায় আমরা উড়িষ্যার সরাকদের দুটো অবস্থার কথা পাচ্ছি। প্রথমতঃ তাঁরা অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন আর দ্বিতীয়তঃ কাপড় বোনার মত নিম্নস্তরের পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পশ্চিমবাংলোতেও কিছু সরাক সম্প্রদায় বস্ত্র শিল্পে আত্মনিয়োগ করেছিলেন একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। হয়তো মধ্য যুগে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সরাক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁত শিল্প সম্প্রদায়গত পেশায় রূপান্তরিত হয়েছিল। আজও বিষ্ণুপুরে এর নিদর্শন আছে।

৩০. পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের পাশে রুক্ষডপুরে এমনি একটি তীর্থঙ্কর মূর্তি আছে, সেখানে চাষীরা কুড়ুল জাতীয় অস্ত্র ধার করে নেয়।

৩১. The people of India.

আগেই বলেছি প্রাচীনকালে উড়িষ্যা জৈন ভূমি বলে পরিগণিত হত। এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে তৈরী করা প্রচুর পরিমাণে সরাকদের ভাস্কর্য শিল্প ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এর মধ্যে খণ্ডগিরির গুহা চিত্র সব থেকে প্রাচীন। হাতিগুম্ফা, রাণীগুম্ফা, জয়-বিজয় গুম্ফা প্রভৃতি জৈন ভাস্কর্য শিল্পের জন্য বিখ্যাত। গুম্ফার দ্বারে কোথাও প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাতি। আবার কোথাও বা কাহিনী চিত্র আছে। এইসব ভাস্কর্য শিল্পকলা খণ্ডগিরির প্রাচীন গুহাগুলোর শিল্প উৎকর্ষতা ও গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। রাণীগুম্ফার প্রাচীন কাহিনী চিত্র আমাদের মনকে সেকালের এক অলিখিত ইতিহাসের পাতায় টেনে নিয়ে যায়।

বালেশ্বর জেলার চরম্পা গ্রামে শান্তিনাথের একটি সুন্দর মূর্তি আছে। তাছাড়া আড়খপুরে আছে ঋষভনাথের মূর্তি। উড়িষ্যার কটকে একটি সুন্দর জৈন মন্দির আছে। এখানে বহু তীর্থঙ্কর মূর্তি সংরক্ষিত আছে। এই সব তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলোর মধ্যে পার্শ্বনাথ, ঋষভনাথ, মহাবীর, অজিতনাথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে ঋষভনাথকে শিবরূপে সাজিয়ে পুজো করার রীতি আছে। প্রাচীনকালে ঋষভনাথ ও শিবকে অভিন্ন দেবতা বলে মনে করার একটা রীতি গড়ে উঠে ছিল। কেউঞ্ঝর জেলার আনন্দপুর সাব-ডিভিশনের নয় মাইল দূরে কোড় সিংড়ি গ্রামে শতাধিক তীর্থঙ্কর মূর্তি ও যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। এই স্থানটি আগে তোষল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। হয়তো এটাই ছিল অতীতের শৈলপুর গ্রাম। সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত এইসব শিল্পকলা যেন আমাদের কানে কানে অতীতের কথা বলে যায়। এগুলো যেন পাষাণ ফলকে রচিত ইতিহাসের এক একটি পাতা। বল্লভ ভাইয়ের ভাষায় বলা যায়-

The Jain architecture is nothing but a kind of history, that it is a standing and living record and it supplies us a more vivid and lasting picture of a nation than history does.

উড়িষ্যার প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপরেও ওই অঞ্চলের সরাক সংস্কৃতির প্রভাব খুব বেশি। প্রকৃতপক্ষে উড়িষ্যার প্রাচীন সাহিত্যের মূল ভিত্তিটাই রচনা করেছেন শ্রাবক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দ।

উড়িষ্যার কোনও কোনও পাহাড়ী অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে কৈড়া পরতোলা গান শোনা যায়। এই গানের মধ্যেও আছে সরাক সংস্কৃতির প্রভাব।

উড়িষ্যার প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এমনকি বৈদিক আর্য সংস্কৃতির গ্রন্থেও শ্রাবক সংস্কৃতির প্রচুর কথা আছে। সারলা মহাভারতে শ্রাবক সংস্কৃতির বেশ কিছুটা প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। এই গ্রন্থের এক স্থানে বলা হয়েছে-

রাধাচক্রে বুলু আছে সাত তাল উচে।
তালে উপরে পটাল আছে যে সুসঙ্কে।।

এখানে "রাধাচক্র" শব্দটি শ্রাবক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হরিবংশ পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। সংস্কৃত মহাভারতে রাধাচক্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেকে আবার মনে করেন যে রাধাচক্র শব্দটি জৈন গ্রন্থ পদ্মপুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। যাই হোক সারলা মহাভারতে যে শ্রাবক সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মধ্য যুগে শ্রী শ্রী চৈতন্যদেবের জীবন ও বাণীর প্রভাবে বাংলা ও উড়িষ্যায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই সব গ্রন্থের মধ্যে ভাগবতের স্থান সবার উপরে। এই ভাগবত গ্রন্থের উপরেও শ্রাবক সংস্কৃতির প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছে। উড়িষ্যার জগন্নাথ দাসের ভাগবতে ঋষভনাথের কথা আছে। এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ঋষভদেব তাঁর শত পুত্রকে যে সব উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে কেবল মাত্র শ্রাবক সংস্কৃতির প্রভাবই নয়, প্রকৃতপক্ষে শ্রাবক সংস্কৃতিকেই তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আছে-

শ্রী শ্রী ঋষভদেব উবাচ
ভো পুত্র মানে সাবধান,
শুনহে আমার বচন।
যে প্রাণী যে কার্য মান
নিরতে করে আচরণ
সে প্রাণী ব্যর্থ এ সংসারে
পড়ে নরক মহা ঘোরে।

কেবলমাত্র জগন্নাথ দাসের ভাগবতেই নয়, চৈতন্য দাস বিরচিত বিষ্ণুগর্ভ পুরাণ গ্রন্থেও ঋষভদেব ও ভরতের চরিত্র আছে। এইভাবে উড়িষ্যার প্রাচীন সাহিত্যেও সরাক সংস্কৃতির এক বিশেষ ধরণের প্রভাব দেখা যায়।

উড়িষ্যার সরাক সংস্কৃতি নিয়ে বেশ কিছু কাহিনী কিংবদন্তীমূলক লোককথা বা রূপকথা জাতীয় কাহিনী প্রচলিত আছে। এইসব কাহিনীগুলো মানের দিক দিয়ে খুব উন্নত ও মনকে বড়ই আকর্ষণ করে। সরাক সংস্কৃতি নিয়ে রচিত উড়িষ্যার লোক কাহিনীগুলোর মধ্যে একটি কাহিনী আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব। কাহিনীটির নাম চিত্রসেন পদ্মাবতী।

কোনও এক সময়ে কলিঙ্গ দেশে বসন্তপুর নামে একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন বীরসেন। তাঁর স্ত্রীর নাম রত্নমালা। আর তাঁর ছেলের নাম চিত্রসেন।

বীরসেনের মন্ত্রী পুত্র রত্নসার চিত্রসেনের পরম বন্ধু ছিলেন। এই দুই বন্ধুর কন্দর্প নিন্দিত রূপ ছিল। তাঁদের দেখলে বসন্তপুরের মেয়েরা চোখ ফেরাতে পারত না। দুজনেই ছিলেন সুন্দরী নারীদের কামনার বস্তু। নগরের মেয়েরা সব সময় রাজপুত্র আর মন্ত্রী পুত্রের রূপ দেখতে রাজপথে দাঁড়িয়ে থাকত। চিত্রসেন এবং রত্নসারের এই অনিন্দ্য সুন্দর রূপ থেকেই জন্ম নিল জনসাধারণের মনে হিংসা। রাজ্যের প্রজারা এই দুই কুমারের চরিত্রকে কলুষিত করলেন হিংসার নোংরা দৃষ্টি দিয়ে। তারপর তাঁরা দল বেঁধে বসন্তপুরের রাজাকে বাধ্য করলেন চিত্রসেন এবং রত্নসারকে নির্বাসন দিতে।

মিথ্যা অপবাদ মাথায় নিয়ে দুই বন্ধু নির্বাসিত হয়ে আশ্রয় নিলেন এক গভীর জঙ্গলে। এই জঙ্গলে একদিন রাত্রে চিত্রসেন যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন রত্নসার দূর থেকে ভেসে আসা জনমানবের কলরব শুনতে পেলেন। তিনি চিত্রসেনকে ঘুম থেকে উঠালেন। তারপর দুই বন্ধুতে মিলে যে দিক থেকে কোলাহল আসছিল সেই দিকে যাত্রা করলেন।

কিছুক্ষণ পর দুই বন্ধু হাজির হলেন এক মন্দিরে। মন্দিরে শান্তিনাথের বিগ্রহ ছিল। সেখানে স্বর্গবাসী কিন্নর-কিন্নরীরা উৎসব করছিল। দুই বন্ধু কিন্নরীদের অপূর্ব নৃত্য পরিদর্শন করে প্রায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় মন্দির গাত্রে একটি অসাধারণ সুন্দরী নারীর পাষাণময়ী মূর্তি দেখতে পেলেন। নারী দেহের এত রূপ তাঁরা কখনও দেখেন নি। তাই রাজপুত্র চিত্রসেন ঠিক করলেন যে, যে কোনও উপায়ে তিনি এই অসামান্যা রূপবতী নারীকে বিবাহ করবেন। এই সুন্দরী নারীর নাম পদ্মাবতী। বিশ্বের তিল তিল সৌন্দর্য সংগ্রহ করে তৈরী করেছেন বিধাতা এই নারী দেহ। পদ্মাবতী নাকি এককালে পুরুষদের ঘৃণা করত। এক ভাস্কর্য শিল্পী পদ্মাবতীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পদ্মাবতী কোন পুরুষকেই বিয়ে করতে রাজি হয় নি। শিল্পীর মনের মধ্যে পদ্মাবতীর যে রূপরাশি প্রবেশ করেছিল তাই দিয়ে তিনি এই পাষাণ মূর্তি নির্মাণ করে গিয়েছেন। পাষাণ ফলকে জন্ম দিয়েছেন আর এক পদ্মাবতীকে।

মন্দিরের পাশে এক সরোবর ছিল। এখানে বিশ্রাম করার সময় চিত্রসেন তাঁর পূর্ব জন্মের কথা শুনলেন। শুনলেন আর এক কাহিনী। একদিন এখানে এক সওদাগর পুত্র বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন জিন ভক্ত। তিনি জিন দেবতার পূজো দিয়ে সকলকে অন্নদান করে নিজে অন্ন গ্রহণ করলেন। সেই সরোবরে এক হংস ও হংসী বাস করত। তারা সওদাগর পুত্রের এই কাজের খুব প্রশংসা করল। এই পুণ্যের ফলেই নাকি হংস চিত্রসেন রূপে জন্ম নিয়েছে। আর হংসী হয়েছে পদ্মাবতী।

রাজপুত্র চিত্রসেন তখনই নিজের দেশে ফিরে গেলেন। তারপর পদ্মাবতীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে পদ্মাবতীর দেখা হল। চিত্রসেন এবার পদ্মাবতীকে নিজের মনের কথা বললেন।

পদ্মাবতী জবাবে বলল, - না, আমি পুরুষদের ঘৃণা করি।

– তুমি আগের জন্মে যে পুরুষকে ভালবাসতে সেই পুরুষকেও ঘৃণা কর? জানতে চাইলেন চিত্রসেন।

– সে পুরুষ কোথায় আছেন? প্রশ্ন করল পদ্মাবতী।

– তোমার চোখের সামনে। তুমি চোখ মেলে তাকাও দেখতে পাবে। উত্তর দিলেন চিত্রসেন। অবাক বিস্ময়ে তাকাল পদ্মাবতী।

তারপর পদ্মাবতীকে চিত্রসেন তাঁদের অতীত জীবনের কাহিনী শোনালেন। পদ্মাবতী মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকল চিত্রসেনের দিকে। পুরুষের দেহে এত রূপ সে কখনও দেখেনি। চিত্রসেনের রূপে মুগ্ধ হল পদ্মাবতী। তার পুরুষ বিদ্বেষ দূর হল। চিত্রসেন এবং পদ্মাবতী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এইসময় বসন্তপুরে মহাবীর স্বামী এসেছিলেন তাঁর অমরবাণী শোনাতে কলিঙ্গবাসীকে। রাজা বীরসেন তাঁর উপদেশে মুগ্ধ হয়ে চিত্রসেন পদ্মাবতীকে গৃহে স্থান দিলেন। এরপর পদ্মাবতীর একটি সন্তান হল। সংসার হল পুণ্যময়। এই কাহিনী অতি দীর্ঘ এবং এর কিছু রূপান্তরও আছে। এখানে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে কাহিনীটি বর্ণনা করলাম। এর ইংরাজী ভাষায় অনুবাদও হয়েছে।[৩২]

ভাস্কর্য শিল্প ও সাহিত্য ছাড়াও উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক জীবনে সরাক সংস্কৃতির প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছে। ডক্টর লক্ষ্মীনারায়ণ শাহর মতে উড়িষ্যার জগন্নাথ সংস্কৃতিতেও শ্রাবক প্রভাব আছে।[৩৩] উড়িষ্যার জগন্নাথদেবের মন্দিরে কইলি বৈকুণ্ঠ আছে। এই কইলি বৈকুণ্ঠ শব্দটা শ্রাবক প্রভাব জাত বলেই মনে হয়। শ্রাবক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কৈবল্য শব্দ থেকেই এটা এসেছে বলে মনে হয়।

অনেকে ঋষভদেবকে জগন্নাথদেবের প্রতীক বলেই মনে করেন। ঋষভ সংস্কৃতিই জন্ম দিয়েছে জগন্নাথদেবের ভাব কল্পনাকে। এই কারণেই হয়তো উড়িষ্যার ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থে ঋষভনাথের কথা আলোচিত হয়েছে এবং তাঁর চরিত্রটি স্থান লাভ করেছে।

জগন্নাথ যে ঋষভনাথেরই প্রতীক তার আরও কিছু প্রমাণ আছে। পুরী ও ভুবনেশ্বরে আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়ায় এবং চৈত্র শুক্লা অষ্টমী তিথিতে রথযাত্রা হয়ে থাকে। আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়ায় প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের গর্ভ কল্যাণের শুভ লগ্ন ছিল। তাঁর জন্ম দিনেই রথযাত্রা হয়ে থাকে। তীর্থঙ্করদের গর্ভ সঞ্চার, জন্ম,

৩২. Buddhivjoy, Chitrasen Padmavati Cariam- by Mul Raj Jain.
৩৩. উড়িষ্যা ভাষায় লেখা "উড়িষ্যার জৈন ধর্ম"- ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু।

দীক্ষা, জ্ঞানপ্রাপ্তি, মোক্ষপ্রাপ্তি যে তিথিতে হয় সেই তিথিতেই নাকি স্বর্গের দেবতারা উৎসব পালন করে থাকেন। এইসব তিথিতে শ্রাবক সম্প্রদায় চৈত্য যাত্রা করেন। চৈত্য যাত্রার সঙ্গে রথ যাত্রার প্রচুর মিল আছে। এতে চৈত্য নির্মাণ করে তার মধ্যে জিন মূর্তি রাখা হয়। তারপর তা নিয়ে নগর পরিক্রমা করা হয়। এই রীতি রথযাত্রার রীতির সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। সুতরাং রথযাত্রার ভাব কল্পনায় শ্রাবক সংস্কৃতির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া উড়িষ্যার শৈব সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় শ্রাবক সংস্কৃতির বেশ কিছুটা দান রয়েছে। ভুবনেশ্বর অঞ্চলে বহু শিব মন্দিরই তৈরী হয়েছে শ্রাবক শিল্পীদের হাতে। বহু জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরকে শিব মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কোন মন্দিরে ত্রিশূল থাকলেই সেটা শিব মন্দির হবে এমন কোন কথা নেই। ত্রিশূল ঋষভনাথের ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গেও যুক্ত।

উড়িষ্যার লোক সমাজে কল্পবৃক্ষে পূজা খুব জনপ্রিয়। বলা বাহুল্য এই কল্পবৃক্ষ পূজা সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। সেকালে শ্রাবক সংস্কৃতি বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করেছে। এমন কি অনার্য সংস্কৃতির উপরেও সরাক সংস্কৃতির দান কম নয়। তাই কেবলমাত্র উড়িষ্যা নয়, সর্বভারতের আর্য অনার্য সংস্কৃতির উপর জৈন সংস্কৃতির অবদান বলতে গিয়ে বলা যায়—

The characteristic feature of Jainsim is its claim to universality. It also declares its object to be to lead all men to salvation and to open its arms not only to the noble Aryans but also to the low form sudra and even to the alien deeply despised in India as the Mlechha.[৩৪]

এ কথার আরও সত্যতাকে আমরা উপলব্ধি করব পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি বিষয়ক আলোচনাগুলোতে।

পুরুলিয়ার পুরাকীর্তি

।। দ্বিতীয় খণ্ড ।।

সৃষ্টির কথা

।। এক ।।

পুরুলিয়ার প্রাচীন মন্দির

সরাক সংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রকে আমরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। কারণ পুরুলিয়ার সরাকদের একটা পূর্ণাঙ্গ

৩৪. G. Buhler

চিত্র চিত্রনের ক্ষেত্রে এটার প্রয়োজন ছিল। পুরুলিয়ার পুরাকীর্তির আলোচনার ক্ষেত্রে এর পটভূমিকাকে আমরা অবশ্য বেশি বাড়াব না। পুরুলিয়া, বর্ধমান জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। তাছাড়া পুরুলিয়ার বিভিন্ন পুরাক্ষেত্রগুলোর পুরাকীর্তির আলোচনার আগে এখানের পাথরের প্রাচীন মন্দিরগুলোর একটা সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

পুরুলিয়ার মন্দির শিল্পে বেশ কিছুটা কলিঙ্গ রীতির প্রভাব আছে। কলিঙ্গ রীতিতে তৈরী প্রাচীন মন্দিরগুলোকে আমরা সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করতে পারি ।

১। রেখা দেউল।
২। পিদা দেউল।
৩। কাখেরা দেউল।

১। রেখা দেউল।

রেখা দেউল হল পুরুষ জাতীয় দেউল। সাধারণভাবে উড়িষ্যার শিব মন্দিরগুলো সবই এই জাতীয় মন্দির। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দিরটিও এই জাতীয় মন্দির। পুরুষ জাতীয় দেবতার জন্য রেখা দেউল নির্মাণ করার রীতি আছে।

রেখা জাতীয় মন্দিরের তিনটি অংশ থাকে। যথা- মস্তক, গণ্ডি এবং বধ।

মস্তক অংশটিকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়। কলস, খাপুরী, অমালক এবং বেঁকি। বধ অংশটাও আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। যেমন, বরাণ্ডি, উপর জঙ্ঘা, বন্ধন, তল জঙ্ঘা, পা ভাগ এবং পিষ্ঠ বা আসন। রেখা জাতীয় মন্দির অনেকটা লিঙ্গাকৃতির হয়ে থাকে।

২। পিদা দেউল।

পিদা দেউল স্ত্রী জাতীয় দেউল। এই জাতীয় দেউলকেও তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- মস্তক, গণ্ডি এবং বধ। এই জাতীয় মন্দিরের বরাণ্ডির উপরের অংশটা প্রায় ত্রিভুজাকৃতি নারীদের ভগদেশ ত্রিভুজাকার। সম্ভবতঃ এই ভাবধারা নিয়েই এই মন্দিরের উপরের দিকটা ভগাকৃতি হয়েছে। উড়িষ্যার মিথুনভাব ধারায় (Mithun Cult) শিব মন্দির রেখা জাতীয়রূপে তৈরী হয়েছে এবং এর পাশেই পিদা মন্দির পার্বতীর জন্য তৈরী করা হয়েছে। অর্থাৎ মন্দির তৈরীর মধ্যেও একটা মিথুন ভাবধারা কাজ করেছে।

৩। কাথেরা দেউল।

কাথেরা দেউল ফেরি নৌকোর আকারে তৈরী। উড়িয়া শব্দ খৈঠা কথারও অর্থ হল ফেরি নৌকো। ফেরি নৌকোর মধ্যে যাত্রী থাকে বলে এই মন্দিরকেও স্ত্রী জাতীয়া মন্দির বলা যেতে পারে। দেবী মন্দিররূপে কাথেরা জাতীয় মন্দিরই নির্মাণ করা হয়।

পুরুলিয়ার প্রাচীন মন্দিরগুলো সবই রেখা জাতীয় মন্দির। পাকবিড়রা, বোড়াম, পাড়া, ছড়রা, তেলকূপী, ভাঙরা প্রভৃতি অঞ্চলের সব মন্দিরগুলোই কলিঙ্গরীতিতে তৈরী রেখা জাতীয় মন্দির। বর্ধমান সীমান্তের বড়াকর এবং বাঁকুড়ার বহুলাড়ার মন্দিরগুলোও এই জাতীয় মন্দির। বড়াকরে চারটি পাথরের মন্দির আছে। এগুলো যদি শিব মন্দিররূপে তৈরী হত তবে অবশ্যই রেখা শ্রেণীর মন্দিরের সামনে পিদা শ্রেণীর মন্দির পার্বতীর জন্য তৈরী হত। আসলে এগুলো শিব মন্দিররূপে তৈরী হয় নি। এগুলো সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মন্দির। ওইগুলোর গর্ভদেশে তীর্থঙ্কর মূর্তি ছিল। তা সরিয়ে শিবলিঙ্গ স্থাপনা করা হয়েছে। বহুলাড়ার মন্দির প্রসঙ্গে একই কথা বলা যেতে পারে। বহুলাড়ার মন্দিরের গর্ভদেশে এখনও তীর্থঙ্কর মূর্তি চোখে পড়ে। পুরুলিয়ায় কোন পিদা শ্রেণীর অর্থাৎ স্ত্রী জাতীয় পাথরের মন্দির নেই। সমস্ত মন্দিরই রেখা শ্রেণীর মন্দির। পাকবিড়রায় তিনটি পাথরের মন্দির আছে। ছড়রায় সাতটির মধ্যে মাত্র একটি এখনও টিকে আছে। বুধপুরে পাঁচ/ছয়টি মন্দিরের মধ্যে বর্তমানে একটিও অবশিষ্ট নেই। পড়ে আছে ধ্বংসস্তুপগুলো। তেলকূপীতে সাত/আটটা মন্দিরের মধ্যে মাত্র দুটি বর্তমানে দেখা যায়। এছাড়া চেলিয়ামার পাশে বাঁদা সৌঁতোড় গ্রামে একটি মন্দির আজও আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সব থেকে প্রাচীন সরাক সংস্কৃতিকে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাড়ায় একটি মন্দির ইতিহাসের নীরব সাক্ষীর মত।

দেউলঘাটায় পাথরের মন্দিরগুলোর বধ অংশটুকু পড়ে আছে আর বাকি সব ভেঙ্গে গিয়েছে; অবশ্য এখানে আশ্চর্য সুন্দর তিনটি ইঁটের মন্দির আছে। সব মন্দিরগুলোই রেখা শ্রেণীর মন্দির (Male edifice)।

সাধারণভাবে পুরুলিয়ার সব মন্দিরের গায়ের অলঙ্করণ বেশ মার্জিত। মন্দিরগুলোর অলঙ্করণ নানা ধরনের জটিল রীতির ভাস্কর্য শিল্পকলায় পূর্ণ থাকলেও কোথাও মিথুন মূর্তি (Couple in Coitus) চোখে পড়ে না। অবশ্য পুরুলিয়ার বিশেষ করে পাকবিড়রার পাথরের মন্দিরগুলোর অলঙ্করণ যুক্ত গায়ের ছাল তুলে ফেলা হয়েছে। পাড়া এবং পাকবিড়রা এই দুই স্থানের মন্দিরগুলোই সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল। অপরদিকে ছড়রা, তেলকূপী, বাঁদা, সৌঁতোড় প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের অলঙ্করণ অনেকটা বরাকরের মন্দিরের অনুরূপ। বরাকরের মন্দিরগুলো

শিবলিঙ্গকে গর্ভে ধারণ করে মন্দির ধ্বংসকারীদের কালো হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু পাকবিড়রার মন্দিরগুলো তা পায় নি, এদের গাত্রাভরণ আজ মাটির তলায় কবরস্থ আছে। যাইহোক, পাকবিড়রা, বুধপুর, বোড়াম, পাড়া, দেউলভিড়া, ভাঙড়া, সবুড়কা, তেলকুপী, বাঁদা, সৌতোড়, বুন্দলা প্রভৃতি স্থানের পুরাকীর্তির নিদর্শনগুলো আমরা এবার আলোচনা করে দেখব।

।। দুই ।।

।। পাকবিড়রা ।।

পাকবিড়রা প্রাচীন সরাক সংস্কৃতির সুবর্ণভূমি। পুরুলিয়ার যাদুঘর। এখানেই আছে পুরুলিয়া জেলার সাড়ে সাত ফুট লম্বা মহান তীর্থঙ্করের বিগ্রহ। পুঞ্চা থেকে দু'মাইল পূর্বে আর পুরুলিয়া থেকে পঁচিশ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত পাকবিড়রা বেশ বড় গ্রাম। গ্রামের লোকেরা বলে পাক্ কথার অর্থ পাখি আর বিড়রা কথার অর্থ তাড়ানো। সুতরাং পাকবিড়রা কথার অর্থ পাখি তাড়ানো। কি জানি এ গ্রামের জঙ্গলময় স্থানের শান্ত ভূমিতে হয় তো এককালে প্রচুর পাখি আস্তানা গেড়েছিল। পরবর্তীকালে তাদের বিরক্ত করে মারত পাখি ধরার দল। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরেই আছে বুধপুর। শুনেছি এখানের গাজন মেলায় প্রচুর পরিমানে শ্যামা পাখির বাচ্ছা কেনা-বেচা চলত। পাকবিড়রার এই প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে রচিত হয়েছিল অতীত যুগের ভাস্কর্য শিল্পের এক গৌরবময় অধ্যায়। এখানের মাটিতে সেকালের চারটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি একেবারে ভেঙে গিয়েছে। বাকি তিনটির গায়ের ছাল তুলে ফেলে নষ্ট করা হয়েছে। মহাকালের কালো হাতের ঘর্ষণে মন্দিরের অলঙ্করণ ক্ষয় হয়ে গিয়েছে এমন কথা ভাববার কোন কারণ নেই। পরিকল্পিতভাবে মন্দিরের অমূল্য ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন যুক্ত ছাল তুলে ফেলা হয়েছে। এর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে মন্দির গাত্রের সর্বাঙ্গে এবং মাটির নীচ থেকে তোলা মন্দির গাত্রের অলঙ্করণের হাজার হাজার ভগ্ন শিলাখণ্ডের মধ্যে।

এখনও মন্দিরগুলোর নীচের দিকের কোন কোন স্থানের অলঙ্করণ রয়ে গিয়েছে। কিছু ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ জৈন শাসন দেব-দেবীর মূর্তি ছাড়া সাধারণ অলঙ্করণ রীতির সঙ্গে বরাকরের মন্দিরগুলোর অলঙ্করণের বেশ কিছুটা মিল ধরা পড়ে। পাকবিড়রার মন্দিরগুলোর অক্ষত রূপটি কেমন ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যাবে বরাকরের মন্দিরগুলোর মাঝেই। প্রায় একই মডেলে এইসব মন্দির তৈরী হয়েছিল। তবে অলঙ্করণে পাকবিড়রার এই মন্দিরগুলো বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য শিল্পে পূর্ণ ছিল।

কিছুদিন আগে পাকবিড়রার মাটি থেকে প্রচুর মূর্তি ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে। এখানে আজও মাটির নীচে আরও শত শত মূর্তি ও অমূল্য

ভাস্কর্য শিল্প সম্পদ মুক্তির আশায় দিন গুণছে। কবে কোন যুগে রাজপুত্র সোনার কাঠি হাতে নিয়ে বীর বিক্রমে মাটি অপসারিত করে কয়েদখানার দুয়ার খুলে দেবেন জানি না। জানি না কতদিন ধরে এইসব প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো এইভাবে মাটি চাপা পড়ে থাকবে।

গ্রামের লোকেরাও এইসব শিল্পকলার নিদর্শনগুলো খুঁড়ে বার করতে চান না। তাঁদের ধারণা এগুলো মাটি থেকে বার করলেই রাতের আঁধারে চুরি হয়ে যাবে।

এখানের মূল বিগ্রহ মহান তীর্থঙ্কর মহাকাল ভৈরবে রূপান্তরিত হয়েছে। মূর্তিটি সাড়ে সাত ফুট লম্বা। চকচকে কালো পাথরে তৈরী হয়েছে। এত সুন্দর, এত নিখুঁত তীর্থঙ্কর মূর্তি পুরুলিয়ায় আর নেই। পণ্ডিতগণের মতে প্রায় দু হাজার বছর আগে মূর্তিটি তৈরী হয়েছিল।

বৈশাখ মাসে এখানে এই তীর্থঙ্কর মূর্তিকেই মহাকাল ভৈরবরূপে পূজা করা হয়। উৎসব হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের তের দিনে। ছোট-খাটো গাজন মেলাও বসে। আগে গাজন সন্ন্যাসীরা চড়ক উৎসবে যোগ দিতেন। বর্তমানে অবশ্য চড়ক পূজা হয় না, তবে খাড়া সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া অনেকে মানসিক বা মানত শোধ করার জন্য পশু বলিও দিয়ে থাকেন। অহিংসা ধর্মের সাধক পুরুষ মহান তীর্থঙ্করের চোখের সামনেই রক্তে মাটি ভিজে যায়। ছাগ শিশু আর্ত চিৎকার আর তাজা রক্তের স্রোতে যে বিভৎস পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাতে মহাকাল ভৈরবের ছদ্মবেশে মহান তীর্থঙ্করের চোখের কোণে জল দেখা দেয়। কিন্তু সে চোখের জলের হিসেব কেউ রাখে না।

পাকবিড়রার মাটি থেকে তোলা কয়েক শত ভাঙাচোরা বিগ্রহ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। নারী মূর্তিগুলো চুরি হয়ে যায়। তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলো পড়ে থাকে।

মূল বিগ্রহ ভৈরবনাথকে রাখার জন্য একটি ঘর বর্তমানে তৈরী করা হয়েছে। এই ঘরে এই বড় বিগ্রহটি ছাড়াও তিরিশ চল্লিশটি বিভিন্ন আকারের মূর্তি অতীতের অমর ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ পড়ে আছে। এছাড়া কিছু যক্ষ ও যক্ষিণীর মূর্তি আছে আর আছে জৈন শাসন দেব-দেবীর মূর্তি।

একটি নারী মূর্তি ও একটি পুরুষ মূর্তি আছে যাঁদের দুজনের বাঁ হাতে রয়েছে শিশু সন্তান। নারীর পায়ের নীচে রয়েছে ঘট আর পুরুষের পায়ের নীচে রয়েছে বাটি (cup)। উপরের দিকে চৈত্য বা বৃক্ষের প্রতিরূপ।

এককালে মিস্টার জে. ডি. বেগলার সাহেব নাকি এই ধরণের একটি মূর্তি মাটি থেকে তুলেছিলেন। একজন বিদেশী পরিদর্শক লিখেছেন–

Mr. Beglar also unearthed from one of the numerous mounds of ruins nearly five Buddhist sculpture of all age, the most remarkable being a male and a female figure under a tree possible the date plam.[৩৫]

মিস্টার বেগলারের মাটি থেকে তোলা যুগল মূর্তিটি পাকবিড়ায় আছে, কিন্তু পাঁচটি বুদ্ধ মূর্তিকে আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। খেজুর গাছের নীচে উপবিষ্ট এই যুগল মূর্তির (chaste couple) শীর্ষদেশে তীর্থঙ্করের মূর্তি রয়েছে। অনেকের মতে এই নারী ও পুরুষ শীর্ষস্থিত তীর্থঙ্করে যক্ষ এবং যক্ষিণী। আবার অনেকে মনে করেন এঁরা তীর্থঙ্করের মাতা ও পিতা। খাজুরাহো, দেবগড় প্রভৃতি স্থানে এই ধরণের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

পাকবিড়রার অবহেলিত এই ছোট্ট ঘরে একটি সুন্দর নারী মূর্তি আছে। সম্ভবতঃ এটি জৈন অম্বিকার মূর্তি। নীচের শিশু দৃষ্টে সে কথাই মনে হয়। আর একটি শিলাপটে রয়েছে সর্পের মুখে লীলায়িত নারী ও পুরুষ। বামপাশে নারী ডানপাশে পুরুষ। সম্ভবতঃ এঁরা ধরণেন্দ্র ও পদ্মাবতী। মাঝখানে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। মূর্তির উপরের দিকটা ভেঙ্গে গিয়েছে। নীচের দিকে দুজন নারী হাত জোড় করে বসে রয়েছে। সবার নীচে দুপাশে দুটি সিংহের মূর্তি আছে।

মন্দিরের অলঙ্করণযুক্ত ছাল বা গাত্র আবরণ যা আগে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল এবং মাটিতে কবর দেওয়া হয়েছিল, তার কিছু অংশ বর্তমানে মাটি থেকে তোলা হয়েছে। ভাঙ্গাচোরা এই সব মন্দির গাত্র আবরণের অলঙ্করণ ভাস্কর্য শিল্পের অতুলনীয় নিদর্শন যেখানে সেখানে পড়ে রয়েছে। এক স্থানের শিলাপটে রয়েছে ময়ূরের পিঠে অষ্টভুজা দেবীর মূর্তি। দেবীর মূল দুটি হাতে কোনরূপ অস্ত্র নেই। বাকি হাতে নানা ধরণের অস্ত্র বা অন্য কিছু রয়েছে বলে মনে হয়। দেবী মূর্তির ডানপাশে সিংহের মুখ দেখা যায়। নীচে চারজন করে দু পাশে আটজন তীর্থঙ্করের মূর্তি উপবিষ্ট অবস্থায় রয়েছে। আর মাঝখানে আছে ধর্মচক্র। এই অষ্টভুজা মূর্তিটি নাকি সপ্তদশ তীর্থঙ্কর কুন্থুনাথের শাসন দেবী অচ্যুতা। উড়িষ্যার সরাক সংস্কৃতিতে ময়ূর বাহিনী দেবীকে শ্রুতিদেবী বলা হয়েছে। যাঁর ডিম থেকে ময়ূরভঞ্জের রাজাদের জন্ম হয়েছে। সুতরাং এইদিক দিয়ে চিন্তা করলে এই ময়ূরবাহিনী দেবীকে জৈন সরস্বতী বলা যেতে পারে। কিন্তু জৈন সরস্বতী আবার চতুর্ভুজা। কেউ কেউ এই মূর্তিটিকে অচ্যুতা মূর্তি বলে বর্ণনা করেছেন। পাকবিড়রা থেকে ১৫/১৬ মাইল পশ্চিমে ভাঙড়া গ্রামে একটি গোলাকার শিলা পটে ষড়ভুজা অচ্যুতার মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য এই মূর্তির নীচের দিকটা ভেঙ্গে গিয়েছে বলে দেবীর বাহনকে

৩৫. Mr. G Coupland.

দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু স্থানেও এই ধরণের অষ্টভূজা ময়ূর-বাহিনী দেবীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

বিভিন্ন আকারের বহু জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি রয়েছে পাকবিড়রায়। কোথাও তিনি পঞ্চফণা সর্পছত্রের নীচে ভাব গম্ভীর পরিবেশে দণ্ডায়মান। আবার কোথাও বা লীলায়িত সর্পকন্যাদের মাঝখানে আজানুলম্বিত বাহুতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আবার কোথাও বা তীর্থঙ্করদের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে যক্ষিণীরা চামর হাতে নৃত্যরত অবস্থায়। একটি শিলাপটে রয়েছে সিংহপৃষ্ঠে নারী মূর্তি।

এইসব দেবী বা নারী মূর্তিগুলোর অলঙ্করণ প্রায় একই ধরনের। পরিপুষ্ট সুন্দর বক্ষদেশ। ভারী নিতম্ব। স্থূল কোমর ও গভীর নাভি দেশ। উন্নত নাসিকা। পাতলা ঠোঁট আর বঙ্কিম ভঙ্গী। মূর্তিগুলোর হাতে পায়ে গলায় অলঙ্কার। কোমরে নিতম্ব লম্বিত মেখলা। শিথিল কবরী বন্ধন। মাথায় ছোট্ট মুকুট।

পাকবিড়রায় একই শিলাপটে বেশ কিছু দুজন করে তীর্থঙ্কর মূর্তি রয়েছে। তাছাড়া তীর্থঙ্করের দুপাশে ছয়জন বা চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মূর্তি রয়েছে। এইসব মূর্তিগুলো তিন থেকে চার ফুট লম্বা। সবগুলোই প্রায় অক্ষত আছে। এগুলো নাকি কয়েক মাস আগে মাটি থেকে তোলা হয়েছে। সর্বাঙ্গে এখনও রয়েছে মাটির গন্ধ। এগুলো দেখলে মনে হয় যেন এই সেদিন এগুলো খোদাই করা হয়েছে। এই ধরণের বহু মূর্তি পাকবিড়রার মাটিতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

একটি বড় আকারের শিলাপটে খোদাই করা আছে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মূর্তি ১৪টি লাইনে। মোট ৩৩৬টি মূর্তি খোদাই করা হয়েছে এই শিলাপটে। দূর থেকে এ শিলাখণ্ড শিলালিপির মত দেখায়। পাকবিড়রায় প্রায় চারটি মন্দিরের মডেল পাওয়া গিয়েছে। এই সব মন্দিরের মডেলগুলো (Miniature Temple) প্রায় সবই কলিঙ্গ রীতিতে তৈরী রেখ দেউল। প্রথম মডেলটি গাঢ় বাদামী রঙের পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। মডেলটির মস্তক অংশটি অবশ্য ভেঙ্গে গিয়েছে। মডেলটির বেঁকি অংশ থেকে বোরাত্তি পর্যন্ত অংশে ৩৮টি খাঁজ আছে। এর চার পাশে চারটি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি রয়েছে। এই মডেলে পাড়া নামক গ্রামের প্রাচীন মন্দিরটি তৈরী হয়েছে। পাড়ার মন্দিরের অলঙ্করণের সঙ্গে এই মিনি মন্দিরটির অলঙ্করণেও বেশ মিল আছে। এটির নীচের দিকটি চৌকোনা হলেও উপরের দিকটা প্রায় গোলাকার।

দ্বিতীয় মিনি মন্দিরটি বর্গাকার তৈরী করা হয়েছে। এটিও বাদামী পাথরে খোদাই করা হয়েছে। এই মিনি মন্দিরের মডেলে কোন মন্দির পুরুলিয়ায় তৈরী হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এটি লম্বায় প্রায় তিন ফুট। মন্দির গাত্রে সুন্দর অলঙ্করণ ও চার পাশে চারটি তীর্থঙ্কর মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। এই মন্দিরের

আকারে অনেকের বাড়িতে তুলসীমঞ্চ বানানো হয়। তাছাড়া পুরুলিয়ার লোক উৎসব টুসু পূজাতে টুসুর জন্য যে কাগজের ঘর বানানো হয় (চৌডোল) তার আকার প্রায় এই মিনি মন্দিরগুলোর মতোই। মনে হয় এই ধরণের মন্দির শিল্পের বেশ কিছুটা ছাপ পড়েছে টুসু উৎসবের চৌডোলের উপর। অনেক জৈন শিল্পকলাই পরবর্তীকালে পুরুলিয়ার লোক শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাই এই মিনি মন্দিরের প্রভাব চৌডোলের উপর পড়াটা কোন অসম্ভব ঘটনা নয়।

তৃতীয় এবং চতুর্থ মিনি মন্দির দুটো নাকি কিছুদিন আগে মাটি থেকে তোলা হয়েছে। তৃতীয় মিনি মন্দিরটার মডেলে তৈরী হয়েছিল পাকবিড়রা, তেলকূপী, বাঁদা, সৌতোড় এবং বড়াকরের মন্দিরগুলো। এটি একটি মন্দিরের প্রচলিত মডেল। চতুর্থ আকারের মিনি মন্দিরটি কতকটা তৃতীয়টির মতই তবে মন্দিরটির অলঙ্করণের শিল্প নৈপুণ্যে মুগ্ধ হতে হয়।

এখানে রক্ষিত প্রতিটি মন্দিরের মডেল এবং মূর্তিকেই ফুল, বেলপাতা ও সিঁদুর দিয়ে পুজো করা হয়। এই পূজোর মালা গলায় দিয়ে পাকবিড়রার মাটিতে সামান্য এক ছোট্ট ঘরের ক্ষুদ্র পরিসরে বন্দী হয়ে রয়েছেন বিশ্বের অহিংসার প্রতীক মহান তীর্থঙ্কর। তাঁর কপালে সিঁদুর। পায়ের নীচে ফুল ও বেলপাতা।

পাকবিড়রায় মন্দির যত আছে তার চার গুণ মন্দিরের কলস যেখানে সেখানে পড়ে আছে। এই মন্দিরের কলসগুলো মন্দিরের শীর্ষদেশে রাখা হয়। সুতরাং যতগুলো মন্দির ততগুলো কলস থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু মন্দিরের চাইতে কলসের সংখ্যা বেশি হল কিভাবে? এই কলসগুলো আবার শিল্প সম্মতভাবে তৈরী হয়েছে। এগুলো দেখলে মন ভরে যায়।

আগেই বলেছি যে পাকবিড়রায় বেশ কিছু বুদ্ধ মূর্তি বিগত শতাব্দীর পর্যটকদের চোখেও পড়েছে। আজ কিন্তু কোন বুদ্ধ মূর্তি দেখা যাবে না। এছাড়া এখান থেকে বেশ কিছু বিষ্ণুমূর্তি ও গণেশমূর্তি স্থানান্তরিত করা হয়েছে এমন নিদর্শন পাওয়া যায়। পাকবিড়রার পাশেই আছে বুধপুর গ্রাম। এই বুধপুর বা বুদ্ধপুর এককালে বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানে বুদ্ধেশ্বরের মন্দির আছে। মন্দিরে পূজা পাচ্ছে একটি চারহাত লম্বা থাম (Pillar)। এখানে দুটো গণেশমূর্তি ও একটা বিষ্ণুমূর্তি পড়ে রয়েছে। এগুলো যে পাকবিড়রা থেকেই আনা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে পাকবিড়রায় বিভিন্ন ধরনের মূর্তি তৈরী হত। ওখানের মাটি থেকে যে শত শত ছোট আকারের তীর্থঙ্কর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে ওগুলো নিশ্চয়ই মন্দিরে ব্যবহার করা হয়নি। ওগুলো তৈরী করে রাখা হয়েছিল।

এই সব কারণে আমার মনে হয় পাকবিড়রায় ভাস্কর্য শিল্পকলা ও মূর্তি নির্মাণের একটি কর্মশালা ছিল (workshop)। এই কর্মশালায় শিল্পীরা নানা ধরনের মূর্তি নির্মাণ করতেন। তাঁরা এখানে জৈন, বৌদ্ধ এবং হিন্দু এই তিন মহান ধর্মের সঙ্গে যুক্ত মূর্তি নির্মাণ করতেন। এখান থেকে বুদ্ধ মূর্তি এবং গণেশ মূর্তি বিদেশে রপ্তানি করা হত। চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, থাইল্যান্ড, জাভা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল।

সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে এই সব মূল্যবান শিল্পকলা বিদেশে পাঠানো হত। পাকবিড়রা অঞ্চলে গণেশ পূজার রীতি কোন দিনই বড় একটা ছিল না। অতীতে এখানে বৌদ্ধ ধর্মের সামান্য প্রভাব থাকলেও কোন দিনই বুদ্ধ পূজার প্রাধান্য ছিল না। এখানে এমন কোন ঐতিহাসিক প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি যাতে করে বোঝা যাবে যে বৌদ্ধ ধর্মের বন্যায় পুরুলিয়ার জঙ্গলময় অঞ্চল ভেসে গিয়েছিল। বুধপুরের বুদ্ধেশ্বরের মন্দির ছাড়া আর কোন বৌদ্ধ মন্দিরের সন্ধান এই অঞ্চলে পাওয়া যায় না। বুধপুরে অবশ্য জৈন ধর্মেরও প্রভাব ছিল। এখানে ৪/৫টি জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও পড়ে রয়েছে। এমত অবস্থায় পাকবিড়রায় বুদ্ধমূর্তি আর গণেশমূর্তির ছড়াছড়ি কেন? সুতরাং এইসব বুদ্ধমূর্তি এবং গণেশমূর্তিগুলো যে ভারতবর্ষের বাইরে পাঠানোর জন্য তৈরী হয়েছিল সেকথা ভেবে নিলে বড় একটা ভুল হয় না। সম্ভবতঃ তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে এখান থেকে বুদ্ধমূর্তি ও গণেশমূর্তি দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পাঠানো হত।

নয়া দিল্লীর জাতীয় প্রদর্শনশালায় ভৌগোলিক এবং কালক্রমানুসারী গণেশ সংস্কৃতির একটা চার্ট আছে (The story of Indian iconography, Ganesh:- Regional and Chronological) তাতে দক্ষিণ ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে গণেশ সংস্কৃতির প্রভাব দেখান হয়েছে। অতীতে তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়েই এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের ছোট ছোট দেশগুলোতে নানা ধরণের শিল্প দ্রব্য পাঠানো হত। পাকবিড়রার সঙ্গে তাম্রলিপ্ত বন্দরের গভীর যোগাযোগই প্রমাণ করে যে এখান থেকে ভাস্কর্য শিল্প ওইসব দেশে পাঠানো হত।[৩৬]

পাকবিড়রার অমর শিল্পকলা ঠিক কোন সময়ে তৈরী হয়েছিল তা বলা শক্ত। সাড়ে সাত ফুট লম্বা মহান তীর্থঙ্করের মূর্তিটি অনেকের মতে দেড় হাজার বছরেরও আগে তৈরী হয়েছিল। তবে পাকবিড়রায় তৈরী করা শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে খাজুরাহো বা দেবগড়ের শিল্পকলার কিছুটা মিল আছে। সুতরাং খাজুরাহো ও দেবগড়ে যখন

---

৩৬. উত্তর বোর্নিয়োর সঙ্গে সরাকদের বেশ কিছুটা যোগাযোগ ছিল। সম্ভবতঃ সরাক শিল্পীরা উত্তর বোর্নিয়োর বিভিন্ন অঞ্চলে বুদ্ধমূর্তি ও গণেশমূর্তি পাঠাত। হয়তো এই কারণে উত্তর বোর্নিয়োর নাম হয়েছে "সারাওয়াক" বিষয়টি গবেষণা করে দেখার মত।

শিল্পকলা তৈরী হয়েছিল তখন পাকবিড়রাতেও শিল্পকলা তৈরী হত। এই ঐতিহাসিক সত্যটা আমরা মেনে নিতে পারি। খাজুরাহোর মন্দিরগুলো ৯১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী হয়েছিল। সুতরাং ১০৫০ খৃষ্টাব্দের আগেই পাকবিড়রার শিল্পকলা তৈরী হয়েছিল এটা আমরা মেনে নিতে পারি। আর একটা কথা, খাজুরাহো ও উড়িষ্যার শিল্পকলা তৈরী হয়েছিল সেখানকার রাজা-মহরাজাদের প্রচেষ্টায়। ইতিহাসে তাঁদের নাম আছে। কিন্তু পুরুলিয়ার শিল্পকলার কোন ইতিহাস নেই। পাকবিড়রার অমর শিল্পকলা যাঁদের প্রচেষ্টায় তৈরী হয়েছিল তাঁরা আজ ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গিয়েছেন।

ভারতবর্ষের মাটিতে সবচেয়ে অবহেলিত হয়েছে জৈন শিল্পকলা। সারা দেশের প্রদর্শনশালাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলে দেখা যাবে সব চাইতে কম জৈন শিল্পকলা প্রদর্শনশালাগুলোতে স্থান লাভ করেছে। তাই হয়তো পুরুলিয়ার মাঠে-ময়দানে, পুরাক্ষেত্রগুলোর চারদিকে তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলো গড়াগড়ি যাচ্ছে। যক্ষিণী মূর্তিগুলো অবশ্য নারী মূর্তি বলেই বিভিন্ন স্থানে পাচার হয়ে গিয়েছে। পাকবিড়রার পুরাকীর্তিগুলোর অবস্থা দেখলে আমাদের মনে হয় যেন আমরা প্রতিদিন প্রাচীন ইতিহাসকে মেরে ফেলতে চাইছি। ইতিহাসকে কবর দিয়ে রাখছি। ইতিহাসের গতিকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য আমরা মুখ ফিরিয়ে বসে আছি। কিন্তু আমাদের উত্তর পুরুষেরা কি এ সব দেখে আমাদের ক্ষমা করতে পারবে? তারা যদি কোনদিন আমাদের কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে বসে কি উত্তর দেব আমরা? শৃঙ্খলিত ইতিহাস তো মুক্তির পথ খুঁজবেই।

।। তিন ।।

বোড়াম (দেউলঘাটা)

গ্রামের নাম বোড়াম। দেউল সংলগ্ন কংসাবতীর ঘাট। তাই নাম দেউলঘাটা। কংসাবতীর তীরবর্তী অঞ্চলের বৃহত্তম পুরাক্ষেত্র হল পাকবিড়রা আর দেউলঘাটার স্থান হল দ্বিতীয়।

পুরুলিয়ার জয়পুর থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে কংসাবতীর তীরে বোড়াম একটি ছোট গ্রাম। নদীর দক্ষিণ পাশে পুরাক্ষেত্র দেউলঘাটা। এই অঞ্চলটি কাঁকুরে পাথুরে মাটি দিয়ে তৈরী পুরুলিয়ার বনাঞ্চলের অংশ বিশেষ। কংসাবতীতে বার মাস জল থাকে না। আষাঢ়, শ্রাবণ আর ভাদ্র মাস কংসাবতীর যৌবনকাল। আর বাকি সময়টাতে কংসাবতীকে দেখলে মনে হয় যেন কোন অজানা প্রিয়জনের আশায় জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ক্ষয় করে বসে আছে সে। দেউলঘাটায় ইঁট দিয়ে তৈরী তিনটে মন্দির আছে। আর আছে কয়েকটা পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীনকালে পুরুলিয়া অঞ্চল যে পোড়া মাটির ইঁট শিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা

দেখিয়েছিল এই মন্দিরগুলো তারই নিদর্শন। মন্দিরগুলোর মধ্যে দক্ষিণ দিকের মন্দিরটিই সবচেয়ে বড়। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। প্রায় ২৬ বর্গফুট স্থানের উপর দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি। গর্ভগৃহ প্রায় ৯ বর্গফুট। মন্দিরটি পিরামিডের আকারে উপরে উঠে গিয়েছে। প্রবেশ পথ ত্রিকোণাকার।

যেসব ইঁট দিয়ে এই মন্দিরটি তৈরী হয়েছে তা এমনভাবে তৈরী হয়েছে যা দেখলে মনে হয় যেন মেশিন দিয়ে বানানো হয়েছে। এগুলো প্রায় ১৮ ইঞ্চি লম্বা, ১২ ইঞ্চি চওড়া এবং মাত্র ২ ইঞ্চি পুরু। ইঁটগুলো বেশ পালিশ করা ঝকঝকে।

দ্বিতীয় মন্দিরটি ৪৫ ফুটের মত উঁচু। এটি নদীর ঘাট থেকে প্রায় ১৫০ ফুট দক্ষিণে অবস্থিত। তৃতীয় মন্দিরটি প্রায় ভেঙ্গে গিয়েছে। এই মন্দিরটি নদীর একেবারে তীরঘেঁষা। আরও কয়েক বছর পরে হয়তো এটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মন্দিরের ইঁটগুলো মনে হয় পুড়িয়ে নেওয়ার আগেই একটা বিশেষ ছাঁচে তৈরী করা হয়েছিল। ইঁটগুলোর অলঙ্করণও মনে হয় পুড়িয়ে নেওয়ার আগেই করা হয়েছিল। মন্দিরের দেওয়ালগুলো সযত্নে অলঙ্কৃত করা হয়েছে। সমস্ত অলঙ্করণগুলোই পোড়া মাটির ইঁট কেটে বানানো হয়েছে। এর উপর আবার পলস্তরার আস্তরণ দিয়ে অলঙ্করণগুলিকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। এর দেউল চিত্রগুলো এত হৃদয়গ্রাহী যে চোখ মেলে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। মন্দির ভেঙ্গে যাচ্ছে, দেওয়াল ফেটে যাচ্ছে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে পোড়া মাটির পোড়া হৃদয়, তবু এই সব মন্দিরগুলো সতী লক্ষ্মী রমণীর মত আজও সিঁথির সিন্দুরকে অম্লান রেখে কংসাবতীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। অমূল্য শিল্পকলা সমৃদ্ধ নামাবলী গায়ে দিয়ে মন্দির সুন্দরী যেন সুন্দরের পূজারী মানুষদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। মন্দিরগুলোর প্রাচীর চিত্র সবই জ্যামিতিক আকারে তৈরী হয়েছে। তাছাড়া কিছু নরনারীর মূর্তি, রাক্ষসের মুখ ও রাজহাঁসের চিত্র মন্দির গাত্রে স্থান লাভ করেছে। মন্দিরের বিস্তৃত দেওয়ালে কিছু আল্পনা জাতীয় চিত্র, কিছু সাঙ্কেতিক ধর্মী চিত্র চোখে পড়ে। সবথেকে বড় মন্দিরটিরও মস্তক অংশ ভেঙ্গে গিয়েছে।

মন্দিরগুলোর গর্ভদেশে কিসের বিগ্রহ ছিল তা এখন জানার উপায় নেই। প্রায় শতবর্ষ আগেও বিগ্রহগুলো অপসারিত করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

মিস্টার ই. টি. ডাল্টন মন্দিরগুলোকে সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মন্দির বলে বর্ণনা করেও কিছুটা বৌদ্ধ প্রভাব দেখিয়েছেন।

The only animals I could discern in the ornamentation were goose introduced in the scrolls : the goose is the Booddhist emblem.[৩৭]

৩৭. Notes on a Tour in Manbhum in 1864-65.

কিন্তু পাকবিড়রায় এমন কিছু সরাক মন্দিরের মডেল আছে যেগুলোর অলঙ্করণে রাজহাঁস দেখা যায়। তাই দেউলঘাটার মন্দিরগুলোর অলঙ্করণে রাজহাঁস আছে বলেই এগুলোকে বৌদ্ধ মন্দির বলে ভাববার কোন কারণ নেই। মিস্টার ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার বেশ জোর দিয়ে বলেছেন- These three Temples are all of the same type, and are no doubt correctly ascribed by the people to the srawaks.[৩৮]

এই মন্দিরগুলোকে হিন্দু শিব মন্দির বলে প্রচার করার একটা বিশেষ ধরণের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিগত শতাব্দীতে। সে সময় কোন প্রভাবশালী সরকারী কর্মচারী মন্দির দেখতে এলেই স্থানীয় জনসাধারণ মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে দিতেন। এমনকি দুর্গা মূর্তিরও প্রতিষ্ঠা করা হত।

১৮৬৩-৬৪-তে মিস্টার ই. টি. ডাল্টন এই মন্দিরগুলো পরিদর্শন করেন। তখন তিনি এই সব মন্দিরে কোন বিগ্রহ দেখতে পাননি। তাই তিনি লিখেছেন-

The object of worship whatever they were have disappeared from the fanes...[৩৯] এর কয়েক বছর পরে মিস্টার জে. ডি. বেগলার দেউলঘাটা পরিদর্শন করেন। তিনি এই মন্দিরের গর্ভদেশে গণেশ-কার্তিক সহ একটি দুর্গা মূর্তি দেখতে পান।[৪০] গণেশ-কার্তিক সহ একটি ছোট আকারে চতুর্ভুজ দেবী মূর্তি দেউলঘাটায় রাখা আছে। জানি না মিস্টার বেগলার এই মূর্তিই দেখেছিলেন কিনা। সম্ভবতঃ এই ধরণের মূর্তি মাটি থেকে তুলে সে সময় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্থানীয় জনসাধারণ।

দেউলঘাটা পুরাক্ষেত্রের পুরাকীর্তির আর একটা দিক আছে। এটা হল এখানের ভাস্কর্য শিল্প। গণেশ-কার্তিক সহ চতুর্ভুজা যে মূর্তিটি মিস্টার বেগলার দেখেছিলেন তিনি তার কোন পরিচয় দিয়ে যান নি। মূর্তিটি সরাক শিল্পীদের দ্বারা তৈরী হলেও এটি কোন হিন্দু পুরাণসম্মত দেবী মূর্তি বলেই মনে হয়। এই ধরণের দুটি মূর্তি দেউলভিড়্যায় (পাড়া থানায়) রক্ষিত আছে। কিন্তু দেউলভিড়্যার চতুর্ভুজা দেবী মূর্তির মধ্যে যে নারীসুলভ কমনীয়তা আছে দেউলঘাটার এই মূর্তির মধ্যে তা পাওয়া যায় না। এই মূর্তির মুখমণ্ডল পুরুষোচিত কাঠিন্যে ভরা। মহাভারতে চতুর্ভুজা দুর্গা মূর্তির কথা আছে। মহাভারতকার লিখেছেন- শবরৈঃ বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা। শবর বা কিরাত সম্প্রদায়ের এই দেবী চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা। এই দেবীর নাম পর্ণ শবরী। তিনি মদ্য, মাংস প্রিয়া কুমারী দেবী।

৩৮. Statistical Accounts of the District of Manbhum.
৩৯. Notes on tour in Manbhum in 1864-65.
৪০. Mr. Beglar visited this place in 1872.

দেউলঘাটার এই অঞ্চলটা অতীতে শবর জাতির মানুষের বসবাস ছিল। তাই এখানে পর্ণ শবরীর মূর্তি থাকাটা কোন অসম্ভব ঘটনা নয়। কারণ...Jainism declares its object to be to lead all men to salvation and to open its arms not only to the noble Aryans but also to the low born sudra and even to the alien deeply despised in India as the Mlechha.[৪১] কিন্তু এই মূর্তিটি কি সত্যই পর্ণ শবরীর মূর্তি? পর্ণ শবরী কুমারী দেবী। শিবের সঙ্গে তার তখনও বিয়ে হয়নি, এমত অবস্থায় এই মূর্তির দু'পাশে কার্তিক ও গণেশ থাকবে কেন? যাই হোক মূর্তিটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য বহন করে এনেছে। এই তথ্যটি হল যে একাদশ শতাব্দীর আগেও দুর্গার দু'পাশে কার্তিক-গণেশকে রাখার রীতি ছিল।

পুরুলিয়ার ভাস্কর্য শিল্পের সবচেয়ে বড় বিস্ময়কর সৃষ্টি হল এই দেউলঘাটাতেই প্রাপ্ত অষ্টভুজা দুর্গা মূর্তিটি। এই দুর্গা মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য শিল্পীদের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। অপরূপ শিল্প সম্মত ও অনিন্দ্য সুন্দর ভঙ্গিতে সৃষ্টি হয়েছে এই দুর্গা মূর্তি। এটি উচ্চতায় প্রায় সাড়ে চার ফুট। মূর্তির তিন দিকে সুন্দর চালচিত্র আছে। এই অষ্টভুজা মূর্তিটি অবশ্য অক্ষত নেই। এর বাঁ পাশের তিনটি হাত ও ডান পাশের একটি হাত ভেঙ্গে গিয়েছে। তবু এর শিল্প গুণ এত উচ্চস্তরের যে দেবীর অঙ্গহানীর ত্রুটি চোখেই পড়ে না। দেবী মূর্তির সর্বাঙ্গ অলঙ্করণ করা হয়েছে। এমন কি, দেবীর নিম্নাঙ্গও ঢাকা রয়েছে শুধু অলঙ্কারে। তাই দেবী নগ্ন হলেও নগ্নতা চোখে পড়ে না। দু'পাশের চালচিত্রে আছে বিষ্ণুমূর্তি, হংসবাহিনী সরস্বতীর মূর্তি। এখানে সরস্বতী চতুর্ভুজা, কিন্তু হাতে বীণা যন্ত্র নেই। এছাড়া অন্যান্য দেব-দেবীরও কিছু মূর্তি আছে। চালচিত্রের উপরের দিকে কিছু সাধারণ নর-নারীর মূর্তিও রয়েছে। বীণা যন্ত্র হাতে নারীর অপরূপ ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হতে হয়। দূরে একটি পুরুষ মূর্তি মুগ্ধ হয়ে নারীর বীণা বাদন শুনছে। চালচিত্রের ঠিক মাঝখানে দু'পাশে দুই নৃত্যরতা নারী অপরূপ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দুই নারীর মাঝখানে একটি নক্সা জাতীয় চিত্রের মাঝে নারী ও পুরুষের মিথুন মূর্তি রয়েছে। নক্সা জাতীয় এই চিত্রটি বৃক্ষচৈত্যও হতে পারে।

এই অসাধারণ অষ্টভুজা মূর্তিটি নৃত্যরতা অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। অসুর দেবীর দুই পায়ের ঠিক মাঝখানে আছে। দেবীর ডান পদ আছে, মাথা কাটা মহিষের পৃষ্ঠদেশে। প্রচলিত রীতিতে অসুর দেবীর বামপাশে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে অসুর দেবীর একটু ডানপাশে রয়েছে। প্রচলিত দুর্গা মূর্তির প্রতিটি হাতেই কিছু না কিছু

৪১. G. Buhler.

কালভৈরব, পাকবিরা

সরাক জৈন মন্দির

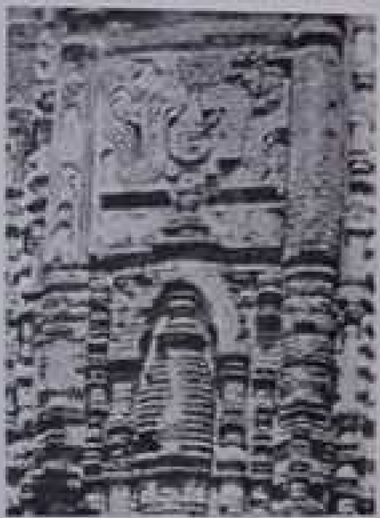

সরাক মন্দির

সরাক সংস্কৃতির এক বৃহৎ কেন্দ্রস্থল

পার্শ্বনাথ, পাকবিরা, ৯ম শতাব্দী

ঋষভনাথ, পাকবিরা, ১০শ শতাব্দী

ঋষভনাথ, মানভূম

মহাবীর, পাকবিরা

শান্তিনাথ, পুরুলিয়া, ১১শ শতাব্দী

দেউলবিঘা, বাঁকুড়া

অস্ত্র থাকে, কিন্তু এই দুর্গা মূর্তির সম্পূর্ণ অক্ষত চারটা হাতের মধ্যে দুটো হাতে কোনরূপ অস্ত্র নেই। অবশ্য একটা হাতে বিশেষ ধরণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে। এই ধরণের চিহ্ন জৈন দেবী মূর্তির মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়।

অসুর, মহিষ, সিংহ সৃষ্টিতে শিল্পী অপরূপ কল্পনার জাল বুনেছেন। অসুর দুর্গা প্রতিমার চাইতে আনুপাতিকভাবে খুব ছোট। অসুর মূর্তিটাকে দাঁড় করালে দেড় ফুটের বেশি হবে না। মহিষ, সিংহ প্রভৃতিগুলো আরও ছোট খেলনার মত। এতে মনে হয় কিছুটা তৎকালীন লোক সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে। প্রাচীন ডোগরা শিল্পে সময় সময় দুর্গা প্রতিমার পায়ের কাছে এই ধরণের ছোট আকারের অসুর, সিংহ, মহিষ প্রভৃতি দেখা যায়।

দেউলঘাটায় আরও কয়েকটি ছোট আকারের মূর্তি রাখা আছে। একটি ছোট গণেশ মূর্তিও আছে। দেউলঘাটাতে কয়েকটি পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। একটি মন্দিরের সারা গর্ভদেশ জুড়ে পাথরের তৈরী এক বিরাট আকারের গৌরীপট আছে। এই গৌরীপটের মাঝখানে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের একটি শিবলিঙ্গ আছে। আগে শিবলিঙ্গটি গৌরীপটের উপরে এমনভাবে লাগান ছিল যে তা ঘোরালে ঘুরত। এখন অবশ্য এই গৌরীপটটি ডাকাতেরা ভেঙ্গে দিয়েছে। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে এই গৌরীপটের ভিতর বুঝি কোন গুপ্তধন লুকানো আছে।

শিবলিঙ্গ, দুর্গা মূর্তি আর সরাকদের তৈরী মন্দির দেউলঘাটাকে অনেকটা মিশ্র সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল করে গড়ে তুলেছিল মনে হয়। সরাক প্রভাবিত পুরাক্ষেত্র হলেও এখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কিছুটা ছাপ পড়েছিল। মনে হয় শিল্পীদের কোন জাত নেই। সরাক শিল্পীরা যে হাতে তীর্থঙ্কর মূর্তি তৈরী করেছেন ঠিক সেই হাতেই দুর্গা মূর্তি বানিয়েছেন। ফলে অষ্টভুজা দুর্গা মূর্তির মধ্যেও হয়তো কিছুটা জৈন প্রভাব পড়ে গিয়েছে। তবে এ মূর্তি যে নিছক জৈন মূর্তি বা জৈন শাসনদেবীর মূর্তি নয় এটা বলতে কোন বাধা নেই। আর একটা কথা, পুরুলিয়ার মন্দিরগুলোতে কলিঙ্গের মন্দির শিল্পের ছাপ পড়লেও ভাস্কর্য শিল্পে উড়িষ্যার প্রভাব খুব সামান্যই পড়েছে। একমাত্র পুরুলিয়ার পাড়া থানার দেউলভিড়্যা ছাড়া আর কোথাও ভাস্কর্য শিল্পে মিথুন সংস্কৃতি (Mithun-cult)-র ছাপ দেখা যায় না। এটা এখানে ভাস্কর্য শিল্পের উপর সরাক সংস্কৃতির বড় ধরণের একটা প্রভাব কিনা তা অবশ্যই ভাববার বিষয়। এখানের অষ্টভুজা দুর্গা মূর্তির চালচিত্রে যে মিথুন মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় সেটাও একটা সাধারণ যুগলমূর্তি (chaste couple) এতে কোনরূপ প্রণয়ভাবধারা ফুটে উঠেনি।

।। চার ।।

।। বুধপুর-পলমা-মহাদেব বেড়্যা ।।

কংসাবতীর কোলে আরো কিছু পুরাক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে বুধপুর, পলমা ও মহাদেব বেড়্যা উল্লেখযোগ্য।

এর আগে পাকবিড়রার শিল্পকলা গণেশ মূর্তির আলোচনা প্রসঙ্গে কংসাবতীর কোল ঘেঁষা গ্রাম বুধপুরের কথা এসে গিয়েছিল। বুধপুর অতীতের খুব নাম করা পুরাক্ষেত্র বলে এর বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে তাছাড়া বুধপুর পুরুলিয়ার লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক উল্লেখযোগ্য স্থান। আমরা আগেই বলেছি বুদ্ধপুর বা বুধপুর বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুটা জড়িত। পুরুলিয়া জেলার বুধপুরেই বৌদ্ধ সংস্কৃতির কথা মনে পড়ে যায়। জেলার অন্যান্য পুরাক্ষেত্রে কিছু কিছু বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেলেও সেখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নাম গন্ধও খুঁজে পাওয়া যায় না।

বুধপুরে বুদ্ধেশ্বরের মন্দির ছাড়াও আর চারটি বড় আকারের মন্দির ছিল। এই চারটি মন্দিরই ছিল সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত।

বুধপুরের অবস্থান ভৌগোলিক দিক দিয়েও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একপাশে কংসাবতী আর অপরপাশে পরসা পাহাড় (Highest point of which forms a station of the great Trigonometrical survey, Long., 86.43 E, lat, 23.7'N) গ্রামের উত্তর পূর্বদিকে একটি বিরাট বড় আকারের পুকুর রয়েছে।

চারটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের চারদিকে পাথরের দেওয়ালগুলোর ভগ্ন অংশ বিক্ষিপ্ত অংশে পড়ে রয়েছে। এগুলো গ্রানাইট স্টোন বলে মনে হয়। চারটি ভগ্ন মন্দিরকেই Lieutinent Beavan সরাকদের তৈরী মন্দির বলে বর্ণনা করেছেন।[৪২] এখানে পড়ে থাকা ভগ্নশিলা খণ্ডগুলোর মধ্যেও প্রচুর অলঙ্করণ আছে। তাছাড়া স্তম্ভের উপর উপবিষ্ট সিংহ ও তীর-ধনু হাতে পুরুষ মূর্তিগুলোও ভাস্কর্য শিল্পের দিক দিয়ে মনকে আকর্ষণ করে। এখানে বেশ কিছু বড় আকারের স্তম্ভ পড়ে রয়েছে। এই পাথরের স্তম্ভগুলো প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া। স্তম্ভগুলোর গায়ে খোদিত চিত্রগুলো ভাস্কর্য শিল্পের দিক দিয়ে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাছাড়া মন্দিরের কোন স্থানে এত বড় আকারের স্তম্ভ লাগান ছিল তা অনুমান করাও সহজ কাজ নয়। এই স্তম্ভগুলো পরিদর্শনের পরে এখানের মন্দিরগুলোর সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা আমাদের গড়ে উঠে। এই সব মন্দির যে খুব বড় আকারের ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

---

৪২. Proceedings of the Asiatic Society for May 1865.

বুধপুর প্রাচীন সংস্কৃতির দিক দিয়েও একটি পুরাক্ষেত্র। অতীতে পুরুলিয়া অঞ্চলের সব চাইতে বড় গাজন মেলাটি অনুষ্ঠিত হত এই বুধপুর গ্রামে। দূর-দূরান্তর থেকে হাজার হাজার নর-নারী সমবেত হত এখানের গাজন মেলায়। লোকসঙ্গীত আর লোকনৃত্যের আসর বসত এখানে। বিগত শতাব্দীতেও বুধপুরের মেলা ছিল খুব জমজমাট। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মিস্টার বিভান এই মেলা দেখে মুগ্ধ হন।[৪৩] সে সময় এই মেলায় হাজার হাজার শ্যামাপাখি ও তোতাপাখির বাচ্চাকে রাজমহলের পাহাড় থেকে ধরে এনে বিক্রি করা হত। সে সময় সারা দেশের পাখি ব্যবসায়ীরা এই মেলায় আসতেন পাখির বাচ্চা কিনতে। এখানের পাখির বাচ্চা কলকাতাতেও রপ্তানি করা হত।

কংসাবতীর তীরবর্তী অঞ্চলের পাশেই আছে আনাই জামবাদ গ্রাম। এই গ্রামের পাশেই একটি পুরাক্ষেত্র আছে। নাম মহাদেব বেড়্যা। এই পুরাক্ষেত্রটি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের রচনায় এখানের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। পুরুলিয়া থেকে পুরাণো মানবাজার রোড ছাড়িয়ে হাঁটা পথ। মহাদেব বেড়্যায় একটি প্রাচীন পাথরের মন্দির ছিল। বহুদিন আগেই ভেঙে গিয়েছে। এই ধ্বংসাবশেষ খনন করেই বেশ কয়েকটি তীর্থঙ্কর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। ধানবাদ জেলার সরাকেরা এখানে একটি আধুনিক মন্দির নির্মাণ করেছেন। তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলোও দেওয়ালে লাগান অবস্থায় বেশ সুরক্ষিত আছে। এখানের সবচেয়ে বড় মূর্তিটি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের। উচ্চতায় এটি প্রায় সাড়ে চার ফুট। চওড়ায় দুই ফুট। মূর্তির দুই পাশে সর্পকন্যাদের দেখা যায়। মূর্তিটি বেশ নিখুঁত ও সুন্দর আছে। এখানে পার্শ্বনাথের আর একটি মূর্তি আছে। মূর্তিটি অবশ্য বেশ ছোট। উচ্চতায় প্রায় দু'ফুট ছয় ইঞ্চি। মূর্তিটির দু'পাশে চারজন তীর্থঙ্কর মূর্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে।

আর একটি মূর্তি সম্ভবতঃ তীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভুর। চালচিত্রে অর্ধচন্দ্র দৃষ্টে তাই মনে হয়। তাছাড়া একটি ঋষভদেবেরও মূর্তি আছে। এখান থেকে বেশ কিছু তীর্থঙ্কর মূর্তি বাইরে পাচার হয়ে গিয়েছে।

তীর্থঙ্কর মূর্তি ছাড়া এখানে একটি কার্তিক মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কার্তিক মূর্তিটি একটি ময়ূরের উপর বসে আছে। ময়ূরের মুখটি ভাঙা। এই মূর্তিটি খুব একটা উন্নত পাথর দিয়ে তৈরী হয় নি। তাই এটিকে খুব পুরাতন শিল্পকলার নিদর্শন বলে মনে হয় না। একটি ছোট আকারের বিষ্ণু মূর্তিও এখানে পাওয়া গিয়েছে।

৪৩. Proceedings of the Asiatic Society for May 1865- Lieutenant Beavan.

একই ধ্বংসস্তুপের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তীর্থঙ্কর মূর্তির উপস্থিতি একটা বিশেষ ইতিহাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সেটা হল মূর্তি কবর দেওয়ার ইতিহাস। অতীতে হয় তো এখানেও বেশ কিছু তীর্থঙ্কর মূর্তি রেখে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। এই ধরণের ঘটনার কথা আমরা বোড়ামের পুরাক্ষেত্রেও দেখতে পাই। সেখানে একটি কূপের মধ্যে বহু তীর্থঙ্কর মূর্তিকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ওখানে একটি ভাঙ্গা শিব মন্দিরও প্রচুর তীর্থঙ্কর মূর্তি দেখেছিলেন। মিস্টার ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার তাঁর বোড়াম পরিদর্শনকালে লিখেছেন-

The grove Temple was dedicated to Siva : but amongst the images were several figures like those already described, that were in all probability the Jain figures belonging to the brick Temples.[৪৪]

মহাদেব বেড়্যার এই ধ্বংসস্তুপেও হয়তো এইসব জৈন বিগ্রহগুলো সঞ্চিত ছিল। পলমা বলরামপুরের পাশে একটি গ্রাম। এই গ্রামটিও কংসাবতীর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই পলমা গ্রামের শিব মন্দিরের দেওয়ালে হেলানো অবস্থায় একটি বড় আকারের তীর্থঙ্কর মূর্তি মস্তকবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। এটির মস্তকবিহীন উচ্চতা প্রায় সাড়ে সাত ফুটের মত। এখানের শিব মন্দিরের ভিতরে একটি ছোট আকারের ঋষভনাথের মূর্তি আছে। তাছাড়া এখানের দুর্গা মন্দিরে ও একটি তীর্থঙ্কর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। বিগত শতাব্দীতে এখানে একটি পাথরের মন্দির দেখতে পাওয়া যেত। সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের আমলে সরাকদের তৈরী প্রাচীন মন্দিরের পাথর দিয়ে এই মন্দিরটি বানানো হয়েছিল। এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য তীর্থঙ্কর মূর্তি মিস্টার ই. টি. ডাল্টন পরিদর্শন করেছিলেন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে। কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মিস্টার জে. ডি. বেগলার যখন এই অঞ্চল পরিদর্শন করেন তখন মূর্তিটি সরিয়ে নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মন্তব্য স্মরণীয়-

The Sculpture of Male figures standing in pedestals and under canopies with Egyptian head dress, the arms hanging down straight by their sides the hands turned in and touching the body near the knees, described by Lieutenant Money and identified by Colonel Dalton as images of the Tirthankaras of Jains are no longer before Mr. Beglar's visit in 1972.[৪৫]

মিস্টার বেগলারের পুরুলিয়া ভ্রমণ কি উদ্দেশ্য ছিল জানি না তবে তাঁর পরিদর্শনকালে অনেক জৈন মূর্তি অপসারণ ও জৈন মন্দিরে শিব দুর্গার মূর্তি

৪৪. Statistical Account of the District of Manbhum.
৪৫. Gazetter of Manbhum District.

স্থাপনের ঘটনা ঘটেছিল। ইতিপূর্বে আমরা দেউলঘাটার বোড়ামের মন্দিরের আলোচনার সময় এটা লক্ষ্য করেছি। জানিনা এটা স্থানীয় জনসাধারণের একটা বিকৃত মানসিকতা এর মধ্যে অন্য কিছু লুকিয়ে ছিল কিনা।

।। পাঁচ ।।
।। পাড়া ।।

গ্রামের নাম পাড়া। পুরুলিয়ার প্রাচীনতম পুরাক্ষেত্র এই পাড়া। প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার বছরের সরাক সংস্কৃতির স্মৃতি বিজড়িত এই গ্রাম। এখানেই আছে পশ্চিমবাংলার প্রাচীনতম একটি পাথরের মন্দির। এই মন্দিরের ভাস্কর্য শিল্প নিয়ে শুধু পুরুলিয়া নয় সারা বাংলা গর্ব করতে পারে। সারা ভারতবর্ষের প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে পাড়ার মন্দির অন্যতম।

পাড়াতে দুটি প্রাচীন মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি পাথরের আর অপরটি ইঁট দিয়ে তৈরী হয়েছে। সম্ভবতঃ আর একটি পাথরের মন্দির এখানে ছিল, যা ভেঙ্গে গিয়েছে এবং যে মন্দিরের পাথর দিয়ে রঘুনাথজীর মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।

এখানে পাথরের মন্দিরটির মধ্যে রয়েছে সরাক সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন। মন্দিরটি গাঢ় বাদামী রঙের পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে। মন্দির নির্মাণের কৌশলের মধ্যে এমন একটি নতুন তথ্য রয়েছে যা জেলার আর কোন মন্দিরে দেখা যায় না। এই মন্দিরের প্রতিটি পাথরের খণ্ডকে মাঝখানে ছিদ্র করে লোহার রড দিয়ে তা গেঁথে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে কোন পাথরের খণ্ডই তুলে নেওয়া বেশ শক্ত। মন্দির নির্মাণে এই লৌহের ব্যবহারটি গবেষকদের কাছে মন্দিরটির কাল নির্ণয় করতে কিছুটা সাহায্য করবে।

মন্দিরের পাথর এবং শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেই ধরা পড়ে যে মন্দিরটি আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছরেরও আগে নির্মিত হয়েছিল। অনেকে তো মন্দিরটির বয়স আড়াই হাজার বছর বলে মনে করেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রসিতকুমার রায়চৌধুরী তাঁর বঙ্গ সংস্কৃতির কথা গ্রন্থে লিখেছেন- "এই সরাকেরাই জেলাটির প্রাচীনতম বাসিন্দা। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তৈরী করা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও পাড়া, বোড়াম প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায়।"[৪৬] তাঁর কথা স্বীকার করলে বলতে হয় যে পাড়ার এই বৃদ্ধ ভগ্ন জীর্ণ মন্দিরটি আড়াই হাজার বছর ধরে সরাক সংস্কৃতির উত্থান পতনের সাক্ষীরূপে পুরুলিয়ার মাটিতে আজও দাঁড়িয়ে আছে। মুছে গেছে গায়ের অলঙ্কার মহাকালের স্রোতে, ক্ষয় হয়ে গিয়েছে দেহের

৪৬. বঙ্গ সংস্কৃতির কথা, পৃষ্ঠা- ৬৪।

সর্বাঙ্গ, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে গায়ের বর্ণ, তবু মহাকালের মহাসমুদ্রে আলোক স্তম্ভের মত সরাক সম্প্রদায়ের মানুষদের দিক নির্ণয় করে বলছে- আমি ইতিহাস হয়ে এখনও বেঁচে আছি। ভয় কি? আমার বুকের উপর পাষাণ ফলকে লেখা ইতিহাস তোমাদের পথ দেখাবে।

এককালে পাড়ার এই মন্দিরের সারা গায়ে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার ছিল। মহাকালের স্রোতে ভেসে আসতে আসতে তা মুছে গিয়েছে। এখনও কোন কোন স্থানে অলঙ্করণের সামান্য যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা দেখলে আমাদের বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। পাথর কেটে এত সুন্দর নিখুঁত ও শিল্প নৈপুন্যে সমৃদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন যাঁরা রেখে গিয়েছেন তাঁদের প্রশংসা না করে পারা যায় না। মন্দির গাত্রের অলঙ্করণের মধ্যে নৃত্যরতা নারীর ছন্দোময় দেহ ভঙ্গিমা দেখে নয়ন ও মন সার্থক হয়ে যায়। কোন সে কালের হৃদয় হতে এসেছে এই নাচের ছন্দ কেউ তা জানে না। কিন্তু অতীতের বাক্যহীন এই নৃত্য পদছন্দের আবেদন ক্ষণিকের জন্য মনকে দুলিয়ে দেয়। অতীতের ভুলে যাওয়া বাক্যহীন কোন গানের মত মনের কোণে ঘা দেয়।

অতীতের মেয়েরা যে নৃত্য চর্চার মাধ্যমে শরীর চর্চাও করতেন এই নৃত্য ভঙ্গি যেন সে কথাও আমাদের মনে করিয়ে দেয়। আমাদের মনে হয় যেন নাচের তালে তালে বর্তমানকালের জিমন্যাস্ট মেয়েদের শরীর চর্চার অপূর্ব কৌশল দেখছি আমরা।

পাড়ার মন্দিরে আরও এক ধরনের নর্তকীর চিত্র খোদিত করেছেন অতীতের ভাস্কর্য শিল্পীরা। এ ধরণের নর্তকীদের দেখলে মনে হয় অপরূপ সাজে সেজে নৃত্য পটীয়সী নারী যেন লীলায়িত ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছেন নৃত্যশালার দিকে। অথবা সলজ্জ ভঙ্গিমায় নর্তকী নৃত্যশালার দুয়ারে দর্শকদের স্বাগত জানাচ্ছেন।

মন্দির গাত্রে আছে ক্ষয়ে যাওয়া যক্ষিণী মূর্তি। আছে অশ্বারোহী পুরুষ। আছে নৃত্যরত অবস্থায় ঘোড়া। কোন কোন স্থানে কিছু কিছু কাহিনী চিত্রও আছে। কিন্তু মূর্তিগুলো ক্ষয় হয়ে গিয়েছে বলে তা ঠিক বোঝা যায় না। এছাড়া পাড়ার মন্দির গাত্রে আছে নানা ধরণের নানা আকারের নক্সা, চিত্র, ফুল। নক্সা চিত্রগুলো জটিল আকারে জ্যামিতির জ্ঞানের উপর তৈরী হয়েছে।

মন্দিরের বাইরের দিকে তিনটি কোলুঙ্গির আকারে ছোট প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। সম্ভবতঃ এই সব স্থানে ছোট আকারের তীর্থঙ্কর মূর্তি রাখা ছিল। বর্তমানে ওই সব তীর্থঙ্কর মূর্তি স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রকোষ্ঠগুলোর দুই পাশে দুটি করে নারী চামর হাতে নৃত্যরতা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া নানা আকারের নর ও নারীর মুখ এখানে ওখানে দেখা যায়। সব কিছুই ক্ষয়ে গিয়েছে।

পাড়ার মন্দিরটিই এখানের একমাত্র প্রাচীন মন্দির যার উপর কোন মানুষের কালো হাত পড়েনি। পাকবিড়রার মত পাড়াতে ধর্মান্ধ মানুষদের কোনরূপ অত্যাচার হয়নি। এই মন্দির মহাকালের স্রোতেই ক্ষয়ে গিয়েছে। মন্দিরের উপরের দিকের প্রায় সমস্ত ভাস্কর্য শিল্পকলাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে যে অংশে মাটির মধ্যে আছে সে অংশের মাটি অপসারিত করলে মন্দিরের অলঙ্করণের প্রকৃত রূপটা ধরা যেতে পারে বলে আমার ধারণা। তবে মন্দিরের বেশ কিছুটা অংশে মাটির মধ্যে থাকলেই এটা আশা করা যায়। মন্দিরটির মস্তক অংশটি ভেঙ্গে গিয়েছে। কলিঙ্গ রীতিতে তৈরী এটিও রেখা দেউল।

পাড়ার এই প্রাচীনতম মন্দিরটির ভাস্কর্য শিল্পের সঙ্গে একমাত্র পাকবিড়রার মন্দিরের ভাস্কর্য শিল্পের তুলনা করা যেতে পারে। তবে পাকবিড়রার মন্দিরের গাত্রালঙ্কার আজ ভূলুণ্ঠিত। তাই এর সামগ্রিক রূপটা দেখা আমাদের সম্ভব নয়। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত বরাকরের মন্দিরগুলো প্রায় অক্ষত আছে। কিন্তু অলঙ্করণ রীতিতে ওইসব মন্দিরের সঙ্গে পাড়ার মন্দিরের কোন মিল নেই। পাড়ার মন্দিরের অলঙ্করণ রীতির সঙ্গে উড়িষ্যার কোনারকের মন্দিরের কিছু মিল আছে। অবশ্য পাড়ার মন্দিরে কোনারকের মন্দিরের মত কোন মিথুন মূর্তি নেই। তবু অনেকে পাড়ার এই মন্দিরকে পুরুলিয়ার কোনারক বলে থাকেন।

পাড়ার মন্দিরের গাঢ় বাদামী রঙের পাথরগুলো মনে হয় বাইরে থেকে আনা হয়েছিল। কারণ এই ধরণের পাথর পুরুলিয়া জেলায় পাওয়া যায় না। এগুলো বেশ শক্ত পাথর। আর শক্ত বলেই দেড় থেকে দু'হাজার বছর ধরে মহাকালের সঙ্গে লড়াই করে আজও টিকে আছে।

পাকবিড়রায় কিছু মন্দিরের মডেল পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে একটি মন্দিরের মডেলের সঙ্গে পাড়ার মন্দিরটি প্রায় মিলে যায়। অবশ্য অলঙ্করণ রীতিটা পাড়ার মন্দিরের সম্পূর্ণ আলাদা।

পাড়ার মন্দির গাত্রে অলঙ্করণের মাঝে যে সব মূর্তি আছে সেগুলো খুব ছোট। তাই দূর থেকে ভাল করে দেখা যায় না। নীচের দিকে অবশ্য কিছুটা বড় আকারের কিছু মূর্তি চোখে পড়ে। কোনারকেও এই ধরণের ছোট আকারের মূর্তি প্রচুর চোখে পড়ে। হয় তো তখনকার দিনে মন্দির গাত্রে ছোট আকারের মূর্তি গড়ারই একটা বিশেষ রীতি ছিল। আজ যদি পাড়ার মন্দিরটি অক্ষত অবস্থায় থাকত তবে কোনারকের সূর্য মন্দিরের মতই এই মন্দিরটিও একটি দর্শনীয় বিষয় বলে বিবেচিত হত।

পাড়ার এই বিখ্যাত মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় চল্লিশ ফুটের মত। অক্ষত থাকলে হয় তো মন্দিরটি পঁয়তাল্লিশ ফুটের মত হত। গ্রামের মানুষের কাছে এই মন্দিরটি লক্ষ্মীর মন্দির বলে পরিচিত। প্রবেশ পথ আয়তাকার গর্ভদেশ বেশ ছোট। এতে কোন বিগ্রহ নেই।

মন্দিরটির নাকি রাজা মানসিংহের আমলে কিছুটা সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু সংস্কারের কোন নিদর্শন মন্দির গাত্রে পাওয়া যায় না। অতীতে মন্দিরটির কোনরূপ সংস্কার সাধন হয়ে থাকলে এটি এমন করে ধ্বংসের পথে নেমে যেত না। পুরুলিয়ার কোন মন্দিরকেই আজ পর্যন্ত সরকারীভাবে বা বেসরকারীভাবে কোনদিন সংরক্ষিত রাখা হয় নি।

এই মন্দিরের কয়েক মিটার পশ্চিমে পাড়ার দ্বিতীয় মন্দিরটি অবস্থিত। এটি অবশ্য খুব প্রাচীন নয়। হয় তো হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল। মন্দিরটি ইঁট দিয়ে তৈরী। উচ্চতায় প্রায় ৪৫ ফুটের মতো। এই মন্দিরের শুধু মস্তকের অংশেই ভাঙ্গেনি; গণ্ডিরও বেশ কিছুটা অংশ ভেঙ্গে গিয়েছে। নির্মাণরীতিতে দেউলঘাটার ইঁটের মন্দিরগুলোর ছাপ আছে। প্রবেশ পথ ওই মন্দিরগুলোর মতোই ত্রিকোণাকার। এটিও পিরামিড তৈরীর রীতিতে তৈরী হয়েছে। তবে দেউলঘাটার মন্দিরের ইঁটগুলোর মতো এই মন্দিরের ইঁটগুলো অতটা উন্নত নয়। তাছাড়া দেউলঘাটার মন্দিরগুলোর গাত্রে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে তা পাড়ার এই মন্দিরে অনুপস্থিত। মন্দিরের গর্ভদেশে একটি ষড়ভূজা দুর্গা মূর্তি আছে। মূর্তিটি খোদিত হয়েছে একটি গোলাকার শীলাপটে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি এই ধরণের একটি দুর্গা মূর্তি ভাঙ্গড়া গ্রামেও পাওয়া গিয়েছে। মূর্তিটি সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত অচ্যুতা মূর্তি। পাড়ার এই অচ্যুতা মূর্তিটি এত ক্ষয়ে গিয়েছে যে এর নাক, মুখ, চোখ কিছুই দেখা যায় না। এই মূর্তিটিই এই মন্দিরে গ্রামের লোকেদের কাছে উদয়চণ্ডী দেবীর রূপে পূজো পাচ্ছে।

পাড়ার তৃতীয় মন্দিরটি কেমন ছিল তা আজ আর বলা যাবে না। আজ থেকে দেড়শ বছর আগেই মন্দিরটি ভেঙ্গে গিয়েছে। অথবা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এ মন্দিরের পাথর দিয়েই গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি আধুনিক মন্দির নির্মিত হয়েছে। মন্দিরটি বর্তমানে রঘুনাথজীর মন্দির বলে পরিচিত।

পাড়াতে কয়েকটি তীর্থঙ্কর মূর্তি ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা আর দেখা যাবে না। ওইসব তীর্থঙ্কর মূর্তি নাকি কাশীপুরের রাজ পরিবারের লোকেরা এখান থেকে নিয়ে গিয়েছেন। এখানে দুটি যক্ষিণী মূর্তি ছিল। যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল এখানে রঙ্কিনী ও ঝঙ্কিনীর লোককথা। বর্তমানে এই দুটি যক্ষিণী মূর্তিও আর নেই। এরা মানুষের কাছে রাক্ষসীরূপে পরিচিত হয়েও মানুষের হাত থেকে রক্ষা পায় নি।

পাড়াতে ভাঙ্গা মন্দিরের কতগুলো থাম এখানে সেখানে পড়ে আছে। গ্রামের মাঝখানে এই ধরণের একটি ছোট আকারের থাম যম বলে পুজো পেয়ে থাকে।

পুরুলিয়া তথা সারা পশ্চিমবাংলার গৌরব হল পাড়ার এই পাথরের মন্দিরটি। দেড় থেকে দু'হাজার বছর ধরে বাঁচার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আজ এটি ধ্বংসে পথের যাত্রী। কিন্তু হার মানে নি। আজও আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে অতীত যুগের গৌরবময় ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন। এখনও এর বুকের উপখোদিত হয়ে আছে এমন সব অতুলনীয়া নারী মূর্তি, আশ্বারোহী পুরুষ মূর্তি, নৃত্যরত মানুষের দেহধারী অশ্ব, যারা অতীতের নাম না জানা গান গেয়ে যায়। এদের নাচের তালে তালে যে ইতিহাসের জন্ম হয় তা পড়ে দেখার সময় আমাদের থাকে না। আমাদের অতীত ভগ্ন মন্দিরের অন্দরে কন্দরে বারে বারে কথা কয়ে যায়; সে কথা কেউ শোনে আবার কেউ শোনে না। কিন্তু তবু ওরা থামে না। মোমের বাতির মত নিজের দেহটা ক্ষয় করে করে আমাদের চোখের সামনের অন্ধকারকে অপসারিত করেই চলেছে।

।। ছয় ।।

।। দেউলভিড়্যা ।।

দেউলভিড়্যা পাড়া থানারই অপর একটি পুরাক্ষেত্র। পাড়া থেকে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে এই পুরাক্ষেত্রটি অবস্থিত। সামনেই রয়েছে হাড়াই নদী। তিনমাস ছাড়া বছরে আর কোন সময় জল থাকে না। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাস হাড়াই পার হয়ে দেউলভিড়্যায় যেতে বেশ বেগ পেতে হয়।

পুরুলিয়া জেলার দেউলভিড়্যা ও র‍্যালিবেড়্যা এই দুটি পুরাক্ষেত্রে তীর্থঙ্কর মূর্তির ছড়াছড়ি থাকলেও শৈব সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বেশ কিছুটা ছাপ রয়েছে।

এর আগে আমরা দেখেছি যে মন্দির শিল্পে উড়িষ্যার কলিঙ্গরীতির প্রভাব থাকলেও উড়িষ্যার মিথুন সংস্কৃতির প্রভাব পুরুলিয়ার ভাস্কর্য শিল্পে বড় বেশি পড়ে নি। তবে দেউলভিড়্যায় এবং র‍্যালিবেড়্যায় উড়িষ্যার মিথুন সংস্কৃতির (Muthuna Cult) প্রভাব বেশ কিছুটা পড়েছে বলেই মনে হয়। এমন কি খাজুরাহোর শিল্পকলার প্রভাবও এখানে পড়েছে। র‍্যালিবেড়্যা এবং দেউলভিড়্যা উভয় স্থানেই শিব ও দুর্গার মিথুন মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। দেউলভিড়্যায় প্রাপ্ত শিব ও দুর্গার মিথুন মূর্তিতে (Heavenly Amorous Couple) শিবের বাম জঙ্ঘাতে পার্বতী বসে আছেন। শিব ও পার্বতীর গায়ে অলঙ্কার থাকলেও নগ্নতা খুব বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। শিবের বাম হাত পার্বতীর পিঠের উপর দিয়ে

তার বাম স্তনে এসে ঠেকেছে। শিবের হাতের বেশ কয়েকটা আঙুলই রয়েছে পার্বতীর স্তনের উপরে। ঠিক এই ধরণের মিথুন মূর্তিতে শিব ও দুর্গাকে দেখা যায় ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরে। খাজুরাহোর পার্শ্বনাথের মন্দিরেও শিব পার্বতীর এই ধরণের মিথুন মূর্তি দেখা যায়। এছাড়া এই ধরণের মিথুন মূর্তি প্রত্নতত্ত্ব প্রদর্শনশালা খিচিং-এ দেখা যায়। খাজুরাহোর শিব ও পার্বতীর মিথুন মূর্তিটি ৯৫০ থেকে ১০০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তৈরী হয়েছিল। আর ভুবনেশ্বরের শিব ও পার্বতীর মিথুন মূর্তিটি তৈরী হয়েছিল ৭৫০ খৃষ্টাব্দের কোন সময়। সুতরাং দেউলভিড়ার পুরাক্ষেত্রটির মূর্তি নির্মাণের কাল সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় হবে।

পুরাণে বিভিন্ন দেব দেবীর প্রণয় লীলার বর্ণনা থাকলেও ভাস্কর্য শিল্পে কোন দেব-দেবীরই মিথুন মূর্তি (couple-in-coitus) বড় একটা দেখা যায় না। যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নগ্নভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণনা করা হয়েছে, পুরাণে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ রাধার দেহ ইচ্ছামত ব্যবহার করেছেন সেখানে ভাস্কর্য শিল্পে কোথাও রাধাকৃষ্ণের এমন মিথুন চিত্র নেই যেখানে শ্রীকৃষ্ণ রাধার কোন অঙ্গে হাত দিয়ে বসে আছেন। ভাস্কর্য শিল্পে শিবই একমাত্র দেবতা যাঁকে দেখা যাবে কাম-উন্মত্ত অবস্থায়। দেউলভিড়ায় হঠাৎ এই ধরণের শিব পার্বতীর মূর্তি আবিষ্কার হওয়াতে পুরুলিয়ার ভাস্কর্য শিল্পের একটা নতুন চিন্তার উদয় হয়েছে। দেউলভিড়ার এই মিথুন মূর্তি সরাক প্রভাবিত মূর্তি একথা বলা যাবে না। তাই পুরুলিয়ার ভাস্কর্য শিল্পের জন্মদাতা একমাত্র সরাক সম্প্রদায়ের পূর্ব পুরুষেরা এই কথা বলারও কোন যুক্তি নেই। তবে দেউলভিড়া পুরাক্ষেত্রে বেশ কিছু তীর্থঙ্কর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং এখানের পুরাক্ষেত্রে সরাকদের প্রভাব ছিল না এমন কথাও বলা যাবে না। সরাক শিল্পীরা হিন্দু দেব-দেবী মূর্তি তৈরী করতে পারেন। হয় তো বিভিন্ন পুরাক্ষেত্রে তা করেছেন। কিন্তু এই ধরণের মিথুন মূর্তি আর কোন পুরাক্ষেত্রে পাওয়া যায় না কেন সেটা অবশ্যই ভাববার কথা। এই কারণে অনেকে পুরুলিয়ার পুরাকীর্তির ইতিহাসে তিনটি যুগের কথা বলেন। প্রথম সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে জৈন যুগ, দ্বিতীয় বৌদ্ধ যুগ এবং তৃতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ্য যুগ। কিন্তু এইভাবে যুগ ভাগ করা কতটা যুক্তিযুক্ত হবে তা বলা শক্ত। অনেক জৈন শিল্পকলাই তৈরী হয়েছে একাদশ শতাব্দীতে। ওই সময়ে আবার হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত শিল্পকলাও তৈরী হয়েছে।

দেউলভিড়ায় দুটো চতুর্ভূজা দেবী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর এক হাতে শিবলিঙ্গ রয়েছে। অন্য হাতে কমণ্ডলু। দুই পাশে গণেশ ও কার্তিক। দেউলঘাটাতে প্রাপ্ত (বোড়াম) চতুর্ভূজা দুর্গা মূর্তির সঙ্গে এই দুটো মূর্তির বেশ মিল আছে।

তবে বোড়ামের দেউলঘাটাতে প্রাপ্ত চতুর্ভূজা মূর্তিগুলো এত সুন্দর নয়। এই মূর্তিগুলোর নারী সুলভ কমনীয়তা নেই। আর এখানে প্রাপ্ত এই চতুর্ভূজা নারীরা অনিন্দ সুন্দরী। দেখলে মনে হয় শিব লোকের সুন্দরী পার্বতী যেন শিবলিঙ্গ হাতে নিয়ে নাচতে নাচতে কৈলাসে যাত্রা করেছেন। এই দুটো মূর্তির মধ্যেও জৈন শিল্পকলার ছাপ বড় একটা দেখা যায় না। অবশ্য আকারের দিক দিয়ে চতুর্ভূজা জৈন সরস্বতীর মূর্তির সঙ্গে এগুলোর বেশ কিছুটা মিল রয়েছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গি প্রায় একই ধরণের।

এখন প্রশ্ন, দেউলভিড়্যার এই শিব পার্বতীর মিথুন মূর্তির (orgiastic couple) মধ্যে কি কোন বৌদ্ধ প্রভাব আছে? সপ্তম শতাব্দীর আগে থেকেই চীন দেশের বৌদ্ধ ধর্মে বামাচার অনুপ্রবেশ করেছিল। প্রাগ্ জ্যোতিষপুরের রাজা ভাস্কর বর্মন চীন দেশের বামাচারী বৌদ্ধদের একটি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বামাচার প্রচারের ক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন। তাছাড়া চীন পরিব্রাজক হুয়ান চুয়াং হয় তো চীন দেশের বৌদ্ধ বামাচার এদেশের মাটিতে এনে থাকতে পারেন। আমাদের দেশে যখন সর্বপ্রথম মিথুন সংস্কৃতি (Mithun cult) ভাস্কর্য শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল, তখন চীন দেশের বৌদ্ধ বামাচার এদেশের মাটিতে আসন পেতে বেশ শক্ত করেই বসেছিল।

তাছাড়া দেব-দেবীর মিথুন চিত্র (Heavenly orgiastic couple) প্রাচীনকাল থেকেই তিব্বতে রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এরও প্রভাব পড়েছে ভারতীয় শিল্পীদের উপর। অতীতের ভারতীয় বৌদ্ধরাও এই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। এর অনিবার্য ফসলস্বরূপ আদিবুদ্ধ কন্যা গৌরীদেবীর সঙ্গে সদাশিবের বিবাহের মতো ঘটনা এসে যাওয়া কোন বিচিত্র নয়। আদ্যাশক্তি চণ্ডিকাই হলেন আদিবুদ্ধ কন্যা। এককালে কান্যকুব্জের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন চীন পরিব্রাজক হুয়ান চুয়াংয়ের সম্বর্ধনার জন্য গাজন উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। সদাশিবের সঙ্গে আদিবুদ্ধ কন্যা পার্বতীর বিবাহের পর সদাশিব পার্বতীকে বামে বসিয়ে গাজনে নেমেছিলেন। এইভাবে বৌদ্ধ বামাচারীদের প্রভাবে সদাশিব ও পার্বতীর মিথুন মূর্তির (orgiastic couple) সৃষ্টি হতে পারে। ইতিপূর্বে ভাস্কর্য শিল্পে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের মিথুন মূর্তিতে চীন দেশের বৌদ্ধ বামাচারের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই দেউলভিড়্যার এই শিব ও দুর্গার মিথুন মূর্তিটি বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত সদাশিব ও পার্বতীদেবীর প্রভাবে তৈরী হওয়াটা কোন বিচিত্র ঘটনা নয়। আর যদি এই শিব-পার্বতীর মিথুন মূর্তিটি শৈব প্রভাবেই তৈরী হয়ে থাকে তবু বলা যায় যে সেই শৈব ধর্মের ক্রম বিকাশের পথে বৌদ্ধ প্রভাব নেই এমন কথা বলা যায় না।

দেউলভিড়া পুরাক্ষেত্রে প্রচুর শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছে। শিবলিঙ্গগুলো সব নতুন। এগুলো কোনদিন পুজো করা হয়নি। অবশ্য বেশ কিছু শিবলিঙ্গ ফেটে গিয়েছে। এখানের পুরাক্ষেত্রে খনন কাজ চালালে আরও কিছু মূর্তি ও শিবলিঙ্গ পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। শিবলিঙ্গগুলোর পাথর অবশ্য খুব একটা ভাল নয়। এগুলো এই অঞ্চলের বেলে পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে। দামোদরের তীরবর্তী অঞ্চলে বেশ কিছু পুরাক্ষেত্রে এই ধরণের বেলে পাথরে তৈরী মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। বিহার, বাংলার সীমান্ত অঞ্চল বেলুঞ্জা অঞ্চলে বেলে পাথরে তৈরী বহু তীর্থঙ্কর মূর্তি দেখা যায়। তাছাড়া সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী বহু অঞ্চলে এই জাতীয় পাথরে তৈরী তীর্থঙ্কর মূর্তি ও শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়েছে।

।। সাত ।।
।। ছড়্‌রা ।।

পুরুলিয়া থেকে চার মাইল উত্তরপূর্বে ছড়্‌রা গ্রাম। সমস্ত গ্রামটি একটি নীচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত। অবশ্য দূর থেকে এই পাহাড় দেখা যাবে না। তবে গ্রামে গেলেই দেখা যাবে গ্রামের সমস্ত ঘর-বাড়িগুলোই পাহাড়ের শক্ত পাথরের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১৯৩১ সালে গ্রামের লোক সংখ্যা ছিল ১৫৩২ জন। বর্তমানে তা প্রায় চার হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এই ছড়্‌রার বুকে লুকিয়ে আছে পুরুলিয়ার পুরাকীর্তির এক গৌরবময় ইতিহাস। এর মাটিতে আছে প্রাচীনকালের বহু ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন। ছড়রা এককালে সরাক সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ছিল। এর পাশেই রয়েছে ঝাঁপড়া, পাড়া, কেলাহি, জবড়্‌রা প্রভৃতি সরাক প্রভাবিত গ্রামগুলো।

এখানে সরাকেরা সাতটি মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। মন্দির আকারে অবশ্য খুব বড় নয়। গ্রানাইট পাথর দিয়ে এগুলো তৈরী হয়েছিল। এগুলো সবই কলিঙ্গ রীতিতে তৈরী রেখা দেউল। এই মন্দিরগুলো পাঁচ থেকে নয় ফুট লম্বা এবং দুই থেকে আড়াই ফুট চওড়া বিরাট বিরাট পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছিল। দুইটি পাথরের মিলনস্থলে সিমেন্ট জাতীয় কোন পদার্থ ব্যবহার করা হয়নি। এগুলো স্টোন কার্পেন্টারী পদ্ধতিতে তৈরী হয়েছিল। উচ্চতায় মন্দিরগুলো মস্তকবিহীন অবস্থায় ত্রিশ ফুটের মতো। মস্তক থাকলে হয়তো আরও পাঁচ ফুট বাড়ত।

ছড়্‌রার এই ধরণের সাতটি মন্দিরের মধ্যে বর্তমানে মাত্র একটি মন্দির অবহেলায় অনাদরে পরিত্যক্ত বাড়ির মতো টিকে আছে। এটা এখন ভিক্ষাজীবী মানুষ আর রাস্তার কুকুরের আবাসস্থল। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকেও আরও একটি মন্দির ছিল। কিন্তু সেটিও বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

মন্দিরের বিরাট বিরাট পাথরের খণ্ডগুলো পড়ে আছে গ্রামের এখানে সেখানে। এইসব মূল্যবান পাথরের মন্দিরগুলো মহাকালের কালো হাত থেকে রক্ষা পেয়ে হয়তো আরও কয়েকটা শতাব্দী টিকে থাকতে পারত, কিন্তু ধর্মীয় বিকার গ্রস্থ লোভী মানুষের নিষ্ঠুর হাতের আক্রমণ এরা সহ্য করতে পারেনি। তাই মন্দিরগুলোর মূল্যবান পাথরগুলো বর্তমানে এখানের বড় মানুষদের বড় বড় বাড়িগুলোর দেওয়াল চাপা পড়ে নীরবে নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন করছে। ছড়রা গ্রামের বড় মানুষদের এমন কোন বাড়ি নেই যেখানে এইসব সরাক মন্দিরের মূল্যবান পাথর লাগানো না হয়েছে। শুধুমাত্র ছড়রা গ্রামের মানুষই নয়; অন্যান্য গ্রামের লোকেরাও মন্দির ভেঙ্গে পাথর ও বিগ্রহ নিয়ে চলে গিয়েছে। এটা যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কত বড় ধরণের অবক্ষয় তা কল্পনা করা যায় না।

এখানে বড় বড় জৈন বিগ্রহগুলো এখন কোথায় আছে তা কেউ জানেনা। পুকুরে, নদীতে, জঙ্গলে, কুয়োতে আর কবরের মাঝে কত বিগ্রহ মানব চক্ষুর অন্তরালে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কেউ রাখেন নি।

বড় বড় বিগ্রহগুলোর কোন সন্ধান না পাওয়া গেলেও ছোট আকারের শতাধিক বিগ্রহ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় এখানের মাটির সঙ্গে মিশে আছে। কিছু কিছু তীর্থঙ্কর মূর্তি শিব মন্দিরে, বাসন্তী মন্দিরে, দুর্গা মন্দিরে ও ধর্ম ঠাকুরের মেলায় স্থান লাভ করে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে।

ছড়রার মহাবীর শিব মন্দিরে প্রবেশ করে মহাদেব হয়েছেন। শিবের সঙ্গে নিত্য পূজা চলছে মহাবীরের। কোন কোন শিব মন্দিরে আবার তিনি শিবলিঙ্গের ঠিক পাশেই অবস্থান করছেন। মন্দিরগুলো ভেঙ্গে যখন গ্রামের লোকেরা মূল্যবান পাথরগুলো বাড়ি তৈরীর জন্য নিয়ে যায় তখন বিগ্রহগুলো স্থান পায় শিব মন্দিরে। সময় সময় তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলো দিগম্বর শিবরূপে গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধাও কেড়ে নিয়েছে। গ্রামের অনেকের ধারণা আবার এইসব বিগ্রহ বিশ্বকর্মার তৈরী। শিব ঠাকুর এখানে বাঘছাল খুলে দিগম্বর হয়েছেন। ছড়রার বাসন্তী মন্দিরে যে তীর্থঙ্কর মূর্তিটি রাখা হয়েছে সেটার নিত্য পূজা হয় না বটে; তবে বাসন্তী পূজার সময় ফুল, বেলপাতা থেকে এটিও বঞ্চিত হয় না। ছড়রার ধর্মমেলার পাশে একটি ঘরে বেশ কিছু তীর্থঙ্কর মূর্তির কাটা মুণ্ড রাখা আছে। এগুলো গ্রামের লোকের কাছে শিব মুণ্ড। প্রতিদিন এগুলো ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করা হয়। মহাবীরের একটি পদ্মাসন বর্তমানে ধর্মরাজ বা ধর্মঠাকুর রূপে পুজো পাচ্ছে। তার পাশেই আছে চারটি মন্দিরের মডেল (Miniature Temple)। বেশ শক্ত পাথর দিয়ে এগুলো তৈরী হয়েছে এবং এখনও অক্ষত আছে। এই মিনি মন্দিরগুলো একটি মাত্র পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে। এগুলো প্রায়

দুফুট উঁচু এবং ছয় থেকে আট ইঞ্চি চওড়া। এই ধরণের একটি মিনি মন্দির বরাহভূম পরগণার পবনপুরে পাওয়া গিয়েছিল। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে কোনশক্য এই মিনি মন্দিরটি ভারতীয় মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বড় বড় তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলো কিভাবে ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং এই ভাঙা বিগ্রহগুলোকে শিব মন্দিরে কবর দেওয়া হয়েছে তার একটা বড় আকারের নিদর্শন পাওয়া যাবে লধুড়কা গ্রামের পাশে একটি শিব মন্দিরে। প্রায় পাঁচ ছয় ফুট লম্বা বিগ্রহগুলোকে ভারী লোহার যন্ত্র দিয়ে মাঝখানে ভাঙা হয়েছে। এই ধরণের চার পাঁচটি বিগ্রহের নীচের দিকটা পড়ে রয়েছে এই শিব মন্দিরে। পুরুলিয়া থেকে কাশীপুর যাওয়ার বড় রাস্তার মধ্যেই পাওয়া যাবে লধুড়কা গ্রাম। এই গ্রামেও একটি সরাক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। এখানেও একটি ক্ষয় হয়ে যাওয়া শিলাপটে খেজুর গাছের নীচে তীর্থঙ্করের মাতা ও পিতাকে দেখা যাবে।

ভাঙাচোরা বেশ কিছু সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মূর্তি পড়ে আছে স্তূপীকৃত অবস্থায় নাটোর স্থানে। এখানের সর্বাপেক্ষা বড় মূর্তিটি সম্ভবতঃ আদিনাথ বা ঋষভনাথের। খোদিত পাথরটির উচ্চতা প্রায় ৫৫ ইঞ্চি এবং চওড়ায় ২৬ ইঞ্চি। মূল মূর্তিটি একটি পদ্মফুলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিটির দুইপাশে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মূর্তি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। এখানের দ্বিতীয় মূর্তিটি ৪৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ২৩ ইঞ্চি চওড়া পাথরের উপর খোদাই করা হয়েছে। মূল জৈন মূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় ৩০ ইঞ্চি। এইসব মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পের দিক দিয়ে অতুলনীয়। ছড়রার শিল্পকলার মতো এগুলোও দিনে দিনে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

।। আট ।।

।। তেলকুপী ।।

পুরুলিয়া জেলার মধ্যে যেসব পুরাক্ষেত্রে সরাক শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একটা মিশ্ররূপ দেখা যায় তেলকুপী সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। অতীতে এখানে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত সরাকদের প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়েছিল এখানের পুণ্যভূমিতে। তাই উভয় সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় এখানে একটা মিশ্র সংস্কৃতির রূপরেখা টানা হয়েছিল মনে হয়। তেলকুপীতে যেমন প্রচুর পরিমানে তীর্থঙ্কর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে ঠিক তেমনি পৌরাণিক বহু দেব-দেবীর বিগ্রহও পাওয়া গিয়েছে। এই সব দেব-দেবীর বিগ্রহ নির্মাণের কৌশলের রীতিতে পাল শিল্পকলার ছাপ দেখা যায়।

মধ্যযুগে তেলকুপীর খুব নামডাক ছিল। এর প্রাচীন নাম তৈলকম্পী। কথিত আছে পাতকুম রাজ্যের জমিদার বিক্রমাদিত্য এখানে এসে গায়ে তেল মাখতেন। তাই গ্রামের নাম তেলকুপী।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে পুরুলিয়া অঞ্চলের আরও দুটি পুরাক্ষেত্রের নাম জড়িয়ে আছে। একটি পবনপুর আর অপরটি দালমি। পবনপুর বরাহভূমের পাশে অবস্থিত। এখানের ভুলা গ্রামে প্রাচীন মন্দির ও কিছু প্রাচীন বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এখানে একটি বিরাট বড় পুকুর আছে। এখান থেকে একটি মন্দিরের মস্তক বিগত শতাব্দীতে ভারতীয় মিউজিয়ামে পাঠানো হয়েছে। এখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতিরও কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

বিক্রমাদিত্যের নামের সঙ্গে যুক্ত দ্বিতীয় পুরাক্ষেত্রটি হল দালমি। দালমি সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থানটা তেলকুপী গ্রাম থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে বিক্রমাদিত্যের দুর্গ ছিল। আজও এখানে বিক্রমাদিত্যের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বিক্রমাদিত্যের ফোর্ট (Vikramaditya's fort) নামে বিরাট একটা ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে। এখানেও একটা বড় পুকুর আছে। নামটা অবশ্য ছোট পুকুর। এছাড়া এখানে একটা ইঁটের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মন্দিরটি অবশ্যই সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত প্রাচীন মন্দির।

রাজা বিক্রমাদিত্য এই দালমি থেকে প্রায় ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করে তেলকুপীতে আসতেন দামোদরে স্নান করতে। সেকালে বারুণী তিথিতে দামোদরে স্নান করাটা পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হত। তাই কিছুদিন আগেও হাজার হাজার মানুষ বারুণীর তিথিতে এখানে এসে দামোদরে স্নান করতেন। তখন তেলকুপীতে বসত পুরুলিয়া অঞ্চলের বিখ্যাত বারুণীর মেলা। গাজন মেলা হিসেবে এই মেলার স্থান ছিল দ্বিতীয়। আর বৃহত্তম মেলাটি বসত বুধপুরে। অবশ্য এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বারুণীর মেলার গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক।

তেলকুপীতে একই আকারের বহু মন্দির তৈরী হয়েছিল। বর্তমানে মাত্র তিনটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনটি মন্দিরই সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। সবচেয়ে বড় মন্দিরটি দামোদরের একেবারে কোলঘেঁষে অবস্থিত। এই মন্দিরে মিশ্র সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে। অবশ্য বর্তমানে মন্দিরটি ভেঙে গিয়েছে। এর ধ্বংসস্তূপের মাঝেই আর একটি মন্দির তৈরী করা হয়েছে। এই নতুন মন্দিরটির আকার অনেকটা শিব মন্দিরের মতো। সম্ভবতঃ মূল মন্দিরটি ভেঙে যাওয়ার পর মন্দিরের বিখ্যাত বিগ্রহ ভৈরবনাথকে নতুন মন্দিরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য এই মন্দিরটির বক্ষদেশ পর্যন্ত দামোদরের পলিমাটির তলায় ডুবে গিয়েছে। হারিয়ে গিয়েছে পুরুলিয়ার জাগ্রত দেবতা ভৈরবনাথের বিগ্রহ। তেলকুপীর এই বিখ্যাত ভৈরবনাথের বিগ্রহটি আসলে কিন্তু তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্তি। ইনি অতীতে বিরূপ নামে পুজো পেতেন। পরবর্তীকালে এই অহিংসা ধর্মের সাধক পুরুষ হিন্দু ব্রাহ্মণ্য

সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভৈরবনাথে রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা পাকবিড়রায় দেখেছি সাড়ে সাত ফুট লম্বা মহান তীর্থঙ্কর মহাবীরকে মহাকালে ভৈরবে রূপান্তরিত হতে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে মহাকাল ভৈরবের রূপটা কি তা আমি জানি না। তবে তীর্থঙ্করদের দিগম্বররূপ ভৈরবনাথের একটা আকর্ষণীয় রূপ কল্পনা করে নিতে এই অঞ্চলের জনগণকে সাহায্য করেছে। তেলকূপীর ভৈরবনাথের বিগ্রহ যে চর্তুবিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীরের মূর্তি সেকথা মিস্টার ই. টি. ডাল্টনও স্বীকার করেছেন-

> There is another of these Temples at Telkupi on the Damodar and there is there an image still worshipped by the people in the neighbourhood which they call Birup. ....it is probably intended for the 24th Tirthankara Vira or Mahavira, last Jain.[৪৭]

মন্দিরের বিগ্রহটি আমি ছোটবেলায় নিজেও দেখেছি। মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম তেলকূপীর বারুণীর জেলায়। বিগ্রহ দেখে জানতে চেয়েছিলাম- ঠাকুর কাপড় পরে না কেন? সেদিন মায়ের কাছ থেকে কোন উত্তর পাইনি।

মন্দিরের বিগ্রহ তীর্থঙ্কর মূর্তি হলেও মূল মন্দিরের নির্মাণ রীতিতে ও শিলাখণ্ডের অলঙ্করণে একটা মিশ্র সংস্কৃতির ছাপ ছিল। কারণ তেলকূপীর মন্দিরটি কোন রাজা মহারাজাদের দ্বারা তৈরী হয় নি। এটা কোন সাধক পুরুষের দ্বারাও নির্মিত হয় নি। দেউলঘাটার মতো তেলকূপী সাধক পুরুষদের সাধন ভজনের স্থান নয়। এই স্থানটা গভীরভাবে যুক্ত ছিল দেশের অর্থনীতির সঙ্গে। মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল দেশের বড় বড় শিল্পপতিদের দ্বারা। আর এই কারণেই রাজা বিক্রমাদিত্যের এই অঞ্চলে ঘন ঘন আগমন ঘটত। তবু মন্দির নির্মাণে সরাক শিল্পীদের হাতের ছাপ ছিল না এমন কথা বলা যায় না। অনেকে মন্তব্য করেছেন মন্দিরটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির হলেও অংশতঃ সরাক ভাস্কর্য শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত। (Mainly Brahmanical but partly Jains).

কিছুটা কিংবদন্তীর আকারে হলেও তেলকূপীর একটা ইতিহাস আছে। এককালে এই গ্রাম ছিল এই অঞ্চলের বিখ্যাত শিল্পনগরী। মিস্টার ডাল্টন নাকি একসময় এই শিল্পনগরীর তোরণদ্বার আবিষ্কার করেছিলেন। এককালে তাম্রলিপ্ত থেকে ঘাটাল, বিষ্ণুপুর, ছাতনা, রঘুনাথপুর হয়ে একটা রাস্তা তেলকূপীতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পরে অবশ্য এই রাস্তা দামোদর পার হয়ে পাটলিপুত্রের দিকে চলে গিয়েছিল। তাম্রলিপ্ত থেকে শিল্পপতিরা এই রাস্তা দিয়েই পাটলিপুত্রে

৪৭. *Ibid*

গুম্ফামন্দির, খণ্ডগিড়ি

পাড়ার সরাক জৈন মন্দির

সরাক জৈনমূর্তি

সরাক জৈনমূর্তি, ধর্মরাজ

তেলকূপী, সরাক জৈন মন্দির

পুরুলিয়ার প্রাচীন শিল্প সংস্কৃতির গৌরব জৈন মন্দির

অম্বিকা, পাকবিরা

যেতেন। পথে পড়ত তেলকুপী নগর। তখনকার দিনে তেলকুপী ছিল এক বিখ্যাত সরাইখানা। এ প্রসঙ্গে মিস্টার কুপল্যান্ড লিখেছেন-

According to tradition, the temples at Telkupi are ascribed to merchants and not to Raja or holyman and the inference is that a large trading settlement sprung upto this point where the Damodar River would present at any rate in rainy seasons, a very considerable obstacle to the Travellers and Merchants."[৪৮]

তেলকুপীর এই ইতিহাসের প্রমাণস্বরূপ মন্দিরের ভাস্কর্য শিল্প ছাড়াও বেশ কিছু পৌরাণিক দেব-দেবীর বিগ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত এই সব নিদর্শন বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ছিল। এই সব মূর্তিগুলোর মধ্যে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, পার্বতী, দুর্গা, মহিষাসুর, কামদেব, রতি, গণেশ ও নৃসিংহ উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তিগুলো আমি নিজের চোখেও ছোটবেলায় দেখেছি কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমার দেশের দুর্ভাগ্য এই ক্ষুদ্র রচনার সঙ্গে সেগুলোর কোন ছবি পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পারলাম না। কারণ এইসব অসাধারণ শিল্পকলার নিদর্শনগুলো সবই আজ দামোদরের পলিমাটিতে চাপা পড়ে হারিয়ে গিয়েছে। হারিয়ে গিয়েছে ভৈরবনাথরূপী মহান তীর্থঙ্কর মূর্তিটিও। পাঁচেত ডাম যখন বাঁধা হল তখন ডুবে গেল তেলকুপী গ্রাম। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল অতীতের শিল্প নগরীর শেষ স্মৃতি। সেদিন কেউ চিন্তা করল না অমূল্য শিল্পকলার কথা। কেউ ওগুলো সরিয়ে রাখার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করল না। কেবল মাত্র পাশের গ্রামের গুরুডির লোকেরা একটা হাল্কা আকারের বিষ্ণুমূর্তি ও কিছু তীর্থঙ্করমূর্তি তেলকুপী থেকে সরিয়ে এনেছিলেন। এই বিষ্ণু মূর্তিটিই বর্তমানে তেলকুপীর সর্বশেষ শিল্পকলার নিদর্শন।

গুরুডিতে রাখা এই বিষ্ণুমূর্তিটির শিল্পরীতি পর্যালোচনা করলে এখানকার শিল্প সংস্কৃতির কিছুটা স্বরূপ আমরা পেতে পারি। বিষ্ণুমূর্তিটি চার ফুট ছয় ইঞ্চির মত লম্বা। দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি রয়েছে। সম্ভবতঃ এই মূর্তি পাল আমলে অর্থাৎ দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর কোন সময় তৈরী হয়েছিল। এই ধরণের একটি বিষ্ণুমূর্তি কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে রাখা আছে। যাদুঘরের মূর্তিটি একাদশ শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল। অবশ্য এই মূর্তির সঙ্গে তেলকুপীতে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির মস্তক আবরণ অংশে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানকার বিষ্ণু মূর্তিটির মস্তক আবরণ তৈরী হয়েছে জৈন শিল্পরীতিতে। পাকবিড়রায় প্রাপ্ত জৈন সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত জৈন শাসন দেব-দেবীদের মস্তক আবরণ (Head dress)

৪৮. Gazetter of Manbhum District.

অংশের সঙ্গে এই মূর্তির মস্তক আবরণে কিছু মিল ধরা পড়ে। জানি না এটা কোন জৈন প্রভব কি না।

তেলকূপীর এই বিষ্ণু মূর্তিটি যে শিল্প রীতিতে তৈরী হয়েছে সেই শিল্প রীতিতেই তৈরী হয়েছে একটি আকর্ষণীয় পুরুষ মূর্তি। এই মূর্তির দেবী দুর্গার মতো দশটি হাত আছে। মূর্তির দু'পাশে দুটি যক্ষিণী মূর্তিও আছে। এই দশভুজ দেবতার কি পরিচয় আমার জানা নেই। তবে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে মূর্তিটি বাসুদেবরূপে পুজো পাচ্ছে। মূর্তিটি দেখা যাবে রঘুনাথপুরের এক মাইল উত্তরে বুন্দলা গ্রামের এক পুরাক্ষেত্রে। এখানে এক বিরাট আকারের গৌরীপট্ট সহ শিবলিঙ্গ আছে। আর আছে একটি পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। সম্ভবতঃ এই মূর্তিটিও একাদশ শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল। সর্পছত্রের নীচে দশভুজ পুরুষ মূর্তি পুরুলিয়ার আর কোন পুরাক্ষেত্রে দেখা যায় না।

তেলকূপীর পাশে একটি গাছের তলায় একটি নারী মূর্তি পড়ে আছে। এই দেবী মূর্তিটি পার্বতী মূর্তি রূপে গ্রামের মানুষদের কাছে পুজো পাচ্ছে। মূর্তিটির দু পাশে কিছু অদ্ভুত মানুষের মূর্তিও খোদিত আছে। হস্তীমুখ মানব এবং অশ্বমুখ মানবের কথা আমরা মঙ্গলকাব্যে পড়েছি। এই নারী মূর্তির ডান পাশের উপরে একজন হস্তীমুখ মানব ও একজন অশ্বমুখ মানব মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে। মূর্তিটি অবশ্য অক্ষত নেই। নীচের দিকটা ভেঙ্গে গিয়েছে। দেবী মূর্তির মুখটাও ভেঙ্গে গিয়েছে। শিল্পরীতিও খুব একটা উন্নত ধরণের নয়। বেলে পাথরে খোদাই করা মূর্তিটি জানি না হিন্দু না জৈন সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ।

তেলকূপীর শিল্পকলায় যতই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব থাক এর প্রাচীন রূপটি যে জৈন সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল তার প্রমাণ বহু তীর্থঙ্কর মূর্তি ও মন্দিরগুলোতে পাওয়া যাবে। আগেই বলেছি এখানে তিনটি মন্দির এখনও টিকে আছে। একটি মন্দিরে মিশ্র সংস্কৃতির ছাপ থাকলেও বাকি দুটো মন্দির পুরোপুরিভাবেই জৈন মন্দির। বরাকরের মন্দির নির্মাণের শিল্পরীতিতে তৈরী এগুলো রেখা দেউল।

বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এখানে একটি বড় আকারের গণেশ মূর্তি দেখেছিলেন। গণেশ মূর্তিটি কালো চকচকে পাথরে তৈরী হয়েছিল। অবশ্য এটিও বর্তমানে আর নেই। ভৈরবনাথের মন্দিরের ভাঙ্গাচোরা শিলাখণ্ডে কিছু ছোট আকারের গণেশ মূর্তি দেখা যায়। তাছাড়া কিছু ভগ্ন শিলাখণ্ডে এমন কিছু পুরুষ ও নারী মূর্তি রয়েছে যা দেখলে লোকশিল্পকলার নিদর্শন বলে মনে হয়। এগুলো হঠাৎ চোখে পড়লে পুরীর জগন্নাথদেবের অসমাপ্ত রূপের কথা বা ধ্যানমগ্ন তীর্থঙ্করদের কথা মনে পড়ে যায়।

তেলকুপী এখন মৃত নগরী। তেলকুপী এখন সম্পূর্ণভাবেই ইতিহাস। স্মৃতিটুকু পড়ে আছে শুধু। আমাদের উত্তর পুরুষেরা আর তেলকুপী নামে কোন গ্রামের সন্ধান পাবে না। তেলকুপীর ভৈরবনাথের শেষ আরতির শিখা নিভে গিয়েছে দামোদর নদী পরিকল্পনার অন্তর্গত পাঁচেত বাঁধ বাঁধার শেষ লগ্নে। দামোদর নদী পরিকল্পনার অর্ন্তগত পাঁচেত বাঁধের জলের তলায় যেন দেশের অমূল্য সম্পদ স্বরূপ বেশ কিছু প্রাচীন শিল্পকলা হারিয়ে গিয়েছে, ঠিক তেমনি কংসাবতী নদী পরিকল্পনায় কংসাবতীর বাঁধের জলেও বহু গণেশ মূর্তি নাকি ডুবে গিয়েছে। পাকবিড়রা পরিদর্শনকালে বুধপুর গ্রামের লোকেদের মুখে এই কথাটা শুনেছিলাম। আমরা আমাদের দেশের পুরাকীর্তিগুলোকে এমনভাবে নষ্ট হবার সুযোগ করে দিই যা অন্য কোন দেশের মানুষ ভাবতেই পারে না।

তেলকুপী আর পাকবিড়রা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করলেই একটা বিষয় আমাদের মনকে বড় বেশি আকর্ষণ করে। সেটা হল এই অঞ্চলের ভৈরব সংস্কৃতি। এখানে যে ভৈরব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার মূলে রয়েছেন তীর্থঙ্কর মহাবীর। তাই ভৈরব শব্দটি এখানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার জাত না সরাক সংস্কৃতি এর জন্মদাতা তা ভাববার বিষয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এখানের ভৈরব সংস্কৃতিটি বাভীরাম শব্দ থেকে এসেছে। আর এই ভৈরব সংস্কৃতিটি (Vira Cult) এই অঞ্চলের প্রাচীনতম সংস্কৃতি। এই কারণে অনেকে পাকবিড়রার মহান তীর্থঙ্কর মূর্তির বয়স প্রায় আড়াই হাজার বছর বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে কুপল্যাণ্ডের মন্তব্য মূল্যবান- তিনি ই. টি. ডাল্টনের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন He (Mr. Dalton) placed them in the district as far back as 500 or 600 years before Christ indentifying the colossal image now worshipped at Pakbirra under the name of Bhiram as Vira the 24th Tirthankara.

তাই এখানের ভৈরব সংস্কৃতিটা জৈনধর্ম জাত এবং জৈনধর্ম থেকে আগত বলা যেতে পারে। এই ভৈরব সংস্কৃতি এখানের শিব সংস্কৃতিকেও পরিপুষ্ট করেছে। পুরুলিয়া অঞ্চলে তিনজন শিব স্থানীয় দেবতার খুব বেশি নামডাক আছে। এই তিনজন হলেন- তেলকূপীর ভৈরবনাথ, আনাড়ার বাণেশ্বর, আর তালাজুড়ির বর্ণেশ্বর।

।। নয় ।।

।। চেলিয়ামা ।।

সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত প্রাচীন ভাস্কর্য শিল্প সারা পুরুলিয়াতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অনুসন্ধান করলে প্রায় প্রতিটি প্রাচীন গ্রামেই সেকালের সরাক সংস্কৃতির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। দামোদর নদের তীরবর্তী অঞ্চল

চেলিয়ামাতেও এককালে গড়ে উঠেছিল সরাক সংস্কৃতির এক বিরাট পুরাক্ষেত্র। তেলকূপীর শিল্প সংস্কৃতির সুবর্ণ যুগের সঙ্গে যুক্ত ছিল চেলিয়ামার সরাক সংস্কৃতি।

পুরুলিয়া জেলার চেলিয়ামা একটি প্রাচীন গ্রাম। গ্রাম থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে বাঁদা নামক স্থানের পলাশবনের মাঝে আকাশ ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেকালের বিরাট এক পাথরের মন্দির। সাধারণ মানুষের ভাষায় দেউল। বহু দূর থেকে এই দেউলের শীর্ষদেশ দেখা যায়। উচ্চতায় ৫৫ ফুটের মত। মন্দিরটির মস্তকের খানিকটা অংশ ভেঙ্গে গিয়েছে।

মন্দিরে যেতে ভাল রাস্তা নেই। পলাশ জঙ্গলের কাঁটা ঝোঁপ মাড়িয়ে যেতে হয়। মনে হয় ওখানে কেউ যায় না। পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ির মত পড়ে রয়েছে। মন্দির গর্ভে বাদুড় আর চামচিকাদের বাস। সময় সময় বৃষ্টি-বাদলার দিনে পথ হারাণো গরু আশ্রয় নেয় মন্দিরে। এই মন্দিরটি দেখে তেলকূপীর ভৈরবনাথের মন্দিরটি কেমন ছিল তা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। আমি যেন ছোটবেলায় দেখা তেলকূপীর মন্দিরটাকেই খুঁজে পাই চেলিয়ামার এই বাঁদা পুরাক্ষেত্রের মন্দিরটির মধ্যে। অবশ্য তেলকূপীর মন্দির গাত্রে যে ধরণের ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন ছিল তা এই মন্দিরে নেই। মন্দিরটি অলঙ্কৃত নয়। তবে মন্দিরে গায়ের খাঁজ ভাঁজগুলো চারদিকে চার রকমের। মন্দিরের গর্ভদেশে আগে নাকি বিগ্রহ ছিল। এখন নেই। মন্দিরের চার পাশে প্রায় ৪০০ বর্গ মিটার স্থান জুড়ে নানা আকারের ভগ্ন শিলাখণ্ড পড়ে রয়েছে। অধিকাংশ শিলাখণ্ডই স্তম্ভের আকারে তৈরী। প্রায় দেড় থেকে দুই ফুটের মত চওড়া এইসব স্তম্ভগুলো প্রায় ছয় সাত ফুট লম্বা। তবে অলঙ্করণহীন। এছাড়া আছে তিন ফুট চওড়া ও ছয় ফুট লম্বা পাটার আকারে কিছু শিলাখণ্ড। এগুলো দিয়ে এখানের কোন মন্দির বা বাসগৃহের ছাদ তৈরী করা হয়েছিল। শিলাখণ্ডগুলো এত ভারি যে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। এই কারণে এইগুলো চুরি হয় না। মন্দিরের এক পাশে বেশ কিছু বাসগৃহ বা আশ্রম জাতীয় কোন সাধনার ক্ষেত্র নির্মিত হয়েছিল, এমন কিছু নিদর্শন মন্দিরের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এখানের মাটির নীচেও বহু আকারের ভগ্ন শিলাখণ্ড রয়েছে। খনন কাজের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালালে হয়তো আরও কিছু ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যেতে পারে।

চেলিয়ামার এই মন্দিরটি আজকের মত আগেও অবহেলিত ছিল। পুরুলিয়া অঞ্চলের অন্যান্য পুরাক্ষেত্রগুলোর কথা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গ কিছু না কিছু লিখে গিয়েছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গ চেলিয়ামার বাঁদার এই মন্দির প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেন নি। অন্ততঃ তাঁদের রচনায় আমার চোখে পড়েনি। মন্দিরটি তেলকূপী থেকে বেশি দূরে নয়। দামোদর নদীরও বেশ কাছে।

অতীতের পুরাক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে চেলিয়ামার কোন যোগাযোগ ছিল না এমন কথা বলা যায় না। পাড়া এবং তেলকুপীর মধ্যবর্তী অঞ্চল চেলিয়ামা। তাম্রলিপ্ত থেকে পাকবিড়রা, বুধপুর হয়ে যে রাস্তাটি দালমি হয়ে বেনারসের দিকে চলে গিয়েছিল তারই একটা শাখা ছড়রা পাড়া হয়ে চেলিয়ামার দামোদর পার হয়ে কাতেরাস গড়ের দিকে চলে গিয়েছিল। ঐ রাস্তার আর একটি শাখা অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চল দিয়ে পালগঞ্জের দিকে চলে গিয়েছিল। চেলিয়ামার যোগাযোগ তেলকুপীর সঙ্গে ছিল। রাজা বিক্রমাদিত্য যখন দালমি থেকে তেলকুপীতে আসতেন তখন অবশ্যই পথে পড়ত চেলিয়ামার এই পুরাক্ষেত্র বাঁদা বা বাঁদাসেটি তোড়।

চেলিয়ামার এই পুরাক্ষেত্রে কোন তীর্থঙ্কর মূর্তি চোখে পড়ে না। তবে চেলিয়ামার গ্রামের মাঝখানে মহামায়ার স্থানে প্রাচীন সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত কিছু সিংহের মূর্তি আঁকা থাম চোখে পড়ে। ছোটখাটো ভাঙ্গা তীর্থঙ্কর মূর্তিও গ্রামের দিকে চোখে পড়ে। এখানে বেশ কিছুটা দূরে রঙ্কৎপুরে একটি পার্শ্বনাথের বিগ্রহ আছে। চাষীরা এই শিলাখণ্ডে কুড়ুল জাতীয় অস্ত্রে ধার করে নেয়। ফলে এই মূর্তিটি ক্ষয়ে গিয়েছে।

এই গ্রামের পাশেই শাঁকা গ্রামের পুকুর পাড়ে পড়ে আছে আর একটি তীর্থঙ্কর মূর্তি। মূর্তিটি উল্টানো অবস্থায় আছে। এটার উপর বসে রাখাল বালকেরা জটলা করে। এই পুকুরের আর এক পাড়ে সায়ের বুড়ি নামে দেবীরূপে পুজো পাচ্ছেন অন্য এক ভগ্ন তীর্থঙ্কর মূর্তি। শাঁকা থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে দুবড়া গ্রামে। এখানের এক মন্দিরে এক তীর্থঙ্কর মূর্তিকে সিমেন্টের পলেস্তরার আস্তরণ লাগিয়ে হনুমান বানানো হয়েছে। ভাবলে দুঃখ হয়, কোন্ সে কালের মহান ভাস্কর শিল্পী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরী করেছেন অহিংসা ধর্মের সাধক পুরুষের পবিত্র দেহ। পাষাণ ফলকে সে দেহ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। আজ আমরা সেই অমর শিল্পীর দেশের উত্তর পুরুষ হয়ে সেইসব অমূল্য শিল্পকলাকে শুধু নষ্টই করছি না, ওগুলোর চরম অবমাননা করছি।

আগেই বলেছি পাতকুম রাজ্যের জমিদার বিক্রমাদিত্য দালমি থেকে এই পথ দিয়েই তেলকুপীতে যেতেন। তাই তাঁর নামটি এই মন্দিরটির সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে। চেলিয়ামার একজন জানালেন যে এই মন্দিরটি নাকি রাজা বিক্রমাদিত্যর সময় তৈরী হয়েছিল। কথাটা যদিও ঠিক নয়, তবু এই মন্দিরের সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের নাম জড়িয়ে থাকাটা কোন অসম্ভব নয়। হয় তো তিনি মন্দিরটির কিছু সংস্কার সাধন করে থাকবেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় এই অঞ্চলে সরাকদের প্রভাব খুব কমে গিয়েছিল। মধ্যযুগে এই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ ঘটে। ১৬৯১

খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময় চেলিয়ামার রাধা বিনোদের মন্দিরটি তৈরী হয়। এই মন্দিরের আশ্চর্য সুন্দর টেরাকোটা শিল্প দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

।। দশ ।।

।। শেষের কথা ।।

আমরা গোড়ার কথাতে পুরুলিয়ার ভাস্কর্য শিল্পের স্রষ্টা হিসেবে সরাকদের কথা আলোচনা করেছি। পুরুলিয়ার বিভিন্ন পুরাক্ষেত্রগুলোর শিল্পকলার আলোচনা করে দেখেছি, এতে প্রায় প্রতিটি পুরাক্ষেত্রেই সরাকদের প্রভাব দেখা গিয়েছে। সরাকদের পুরাক্ষেত্রগুলোর নামের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা যে সব পুরাক্ষেত্রের আলোচনা করেছি, সেগুলোর নামের মধ্যে 'ড়' অক্ষরটা অবশ্যই আছে। একমাত্র তেলকূপী বাদ দিয়ে আর সব পুরাক্ষেত্রের প্রসঙ্গে একথা বলা যেতে পারে। যেমন- পাকবিড়রা, বোড়াম, ছড়রা, পাড়া, দুবড়া, লধুড়কা, দেউলভিড়্যা, র‍্যালিবেড়্যা, মহাদেব বেড়্যা, বাঁদা মৌতোড় প্রভৃতি। এইসব পুরাক্ষেত্রের শিল্পকলার মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশই সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত শিল্পকলা বা বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য বৌদ্ধ শিল্পকলা ও বুদ্ধ মূর্তিগুলো সব পুরাক্ষেত্র থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে বুদ্ধ মূর্তির চাহিদা থাকাতে পুরাক্ষেত্রের মধ্যে খুব কমই বুদ্ধ মূর্তি পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। জৈন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত একমাত্র যক্ষিণী মূর্তিগুলো নারী মূর্তি বলেই এগুলো পুরাক্ষেত্র থেকে পাচার করা হয়েছে। পুরুলিয়ার পুরাক্ষেত্রগুলোতে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত খুব কমই শিল্পকলা পাওয়া গিয়েছে। বিষ্ণু মূর্তি, গণেশ মূর্তি, কার্তিক মূর্তি, দুর্গা মূর্তি এবং শিব পার্বতী মূর্তি যা পাওয়া গিয়েছে তার সংখ্যা তীর্থঙ্কর মূর্তির চাইতে একেবারে নগণ্য। সুতরাং কোন পুরাক্ষেত্রেই হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বড় রকমের প্রভাব ছিল এমন কথা বলা যায় না। দেউলঘাটা (বোড়াম), র‍্যালিবেড়্যা, দেউলভিড়্যা এবং তেলকূপীতে কিছু পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু একমাত্র শিব পার্বতীর মিথুন মূর্তি বাদ দিয়ে আর সব মূর্তিতে কিছু কিছু জৈন প্রভাব দেখা গিয়েছে। পুরাণো দিনের যতগুলো মন্দির এই জেলায় আছে এর মধ্যে সবগুলোই কলিঙ্গ রীতির রেখা দেউল এবং সরাক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মন্দির। এমন কি বর্ধমানের বরাকরের মন্দিরগুলো এবং বাঁকুড়ার বহুলাড়ার মন্দির (সিদ্ধেশ্বরের মন্দির) জৈন মন্দির ছাড়া আর কিছুই নয়। একথা আমরা আগেই পর্যালোচনা করে দেখেছি। সুতরাং ভাস্কর্য শিল্পকলার দিক দিয়ে এখানে যদিও কিছু পৌরাণিক দেব দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে এবং এই দিক দিয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কিছুটা অবদান আছে, কিন্তু প্রাচীন মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য

সম্প্রদায়ের দান একেবারে নগণ্য। অবশ্য মধ্যযুগে বৈষ্ণব প্রভাবিত কিছু মন্দির তৈরী হয়েছে। তবে এগুলো আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।

আমরা দেখেছি এখানের পুরাক্ষেত্রগুলোতে কিছু বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের বড় রকমের প্রভাবের নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি বুধপুরে (বুদ্ধপুরে) পর্যন্ত পাঁচটি মন্দিরের মধ্যে চারটি মন্দিরই সরাক প্রভাবিত মন্দির ছিল। খুব কম সময়ের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব এই জেলার উপর হয় তো পড়েছিল। তবে তা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হাতে নষ্ট হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের অভিমত হল, The original Buddhistic Civilisation was succeeded by Brahmanical dynesty which was eventually destroyed by the oboriginal population, the Bhumij.

কোন পুরাক্ষেত্রে একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত শিল্পকলা দেখা গেলেই যে ধরে নিতে হবে যে ঐ পুরাক্ষেত্রটি একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা অধিগ্রহণ করেছিলেন এমন কথা ভাববার কোন যুক্তি নেই। একই শিল্পী নানা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত শিল্পকলা তৈরী করতে পারেন। এবং পুরাক্ষেত্রগুলোতে সেইসব শিল্পকলা সংরক্ষিত থাকতে পারে। যেমনটা ঘটেছিল পাকবিড়রায়। এখানের শিল্পীরা যেমন হাজার হাজার তীর্থঙ্কর মূর্তি গড়েছেন ঠিক তেমনি শত শত বুদ্ধ মূর্তি এবং গণেশ মূর্তিও বানিয়েছেন। পাকবিড়রার শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্ম বিদেশে রপ্তানী করতেন। এই কথাটা যদি সত্য হয়, তবে পাকবিড়রা কতদিন সরাকদের হাতে ছিল, বা কতদিন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের হাতে ছিল, বা কতদিন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হাতে ছিল, এসব চিন্তা করাটাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আগেকার দিনে প্রতিটি পুরাক্ষেত্রেই শিল্পীরা কাজ করতেন। বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত শিল্পকলা সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তাই ভাস্কর্য শিল্পকলার মাধ্যমে পুরাক্ষেত্রগুলোর পরিচয় জানার চেষ্টা না করে মন্দিরগুলো পর্যালোচনা করে পুরাক্ষেত্রগুলোর পরিচয় জানতে হবে। পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন মন্দিরগুলো প্রায় সবই জৈন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং পুরাক্ষেত্রগুলোও সবই সরাক প্রভাবিত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অনেকের ধারণা এখানের তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলো সরাক শিল্পীদের তৈরী, বৌদ্ধ শিল্পকলা ও বুদ্ধ মূর্তিগুলো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের তৈরী, আবার পৌরাণিক দেব দেবী মূর্তিগুলো হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের তৈরী। এই তথ্যটা যদি ঠিক হত, তবে তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলোর সঙ্গে দুর্গা মূর্তি, গণেশ মূর্তি ও বিষ্ণু মূর্তিগুলো এমন করে কবরস্থ হত না, বা ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যেত না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গ পুরুলিয়ার প্রাচীন মন্দির ও শিল্পকলা নষ্ট করার বেশ কিছুটা দায়িত্ব হিন্দু ব্রাহ্মণদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ওঁদের হাতে তীর্থঙ্কর মূর্তির সঙ্গে গণেশ মূর্তি নষ্ট হল কিভাবে? কিভাবে

দেউলঘাটার অষ্টভুজা দুর্গার অঙ্গহানী ঘটল? মুসলমানরা এই অঞ্চল কোনদিন আক্রমণ করেনি—এটা ইতিহাস সম্মত কথা। তাই এখানের শিল্পকলা ধ্বংস করার কাজে এখানের ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে এখানের আদিবাসীদের কিছুটা হাত ছিল বলে মনে হয়। এতেই প্রমাণিত হয় এখানের সমস্ত শিল্পকলাই সরাক শিল্পীদের দ্বারা তৈরী হয়েছিল। যাঁরা সরাক মন্দির এবং শিল্পকলা নষ্ট করেছেন তাঁরা কোনটা তীর্থঙ্কর মূর্তি আর কোনটা বিষ্ণু মূর্তি তা বিচার করে দেখেন নি। এই কারণে পুরাক্ষেত্রগুলোর একই কবর থেকে ভাঙ্গাচোরা তীর্থঙ্কর মূর্তি, বিষ্ণু মূর্তি, দুর্গা মূর্তি ও বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া যাচ্ছে।

এখানের জনগণ তীর্থঙ্কর মূর্তিকে পাকবিড়রায় মহাকাল ভৈরব আর তেলকূপীতে ভৈরবনাথ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বহু প্রাচীন শিব মন্দিরেও শিবাসনে তীর্থঙ্কর মূর্তি পূজা পাচ্ছে। এমন অবস্থায় এই বিরাট ধ্বংস লীলার সমস্ত দায়িত্ব এখানের সাধারণ মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া ইতিহাস সম্মত হবে বলে আমার মনে হয় না। তাই কিভাবে পুরুলিয়া অঞ্চলের এক বিরাট শিল্প সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটেছে সেটা একটা বিতর্কিত বিষয় বলে আমার মনে হয়। এ নিয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কতটা দায়ী সে বিষয়ে গবেষণার অবকাশ আছে।